না

ভোর বেলা।

অন্ধকার ঘর। পূর্বদিকের কাচের দরজার ভিতর দিয়ে এক ফালি আলো এসে পড়েছে। পশ্চিমের দেওয়াল ঘেঁষে একটি দেরাজ। পুরানো কালের গড়ন। দেরাজের উপর একটি টাইমপিস। উপরে দেওয়ালের গায়ে একখানা ছবি ঝুলছে। বাকী ঘরটা আব্ছা অন্ধকারে ঢাকা। পূর্ব দিকের কাচের জানালায় সিলুয়েৎ ছবির মত দেখা যাচ্ছে। দরজার ওপাশে ঘরের বারান্দায় একজন পেশী-সবল মানুষ মুগুর ভাঁজছে বা বারবেল নিয়ে ব্যায়াম করছে।

ভোরের নিস্তব্ধ পৃথিবী। মধ্যে মধ্যে শোনা যাচ্ছে কল কল শব্দে পাখীর ডাক।

তারই সঙ্গে একসময় সুর মিলিয়ে দেরাজের উপরের টাইমপিসটার এলার্ম বেজে উঠল। প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই ও-ঘরের কাচের দরজায় দেখা গেল ব্যায়াম-রত মানুষটি ব্যায়াম রেখে স্থির হয়ে দাঁড়াল। তারপর দরজা খুলে এ-ঘরে ঢুকল। উনিশ-কুড়ি বছরের একটি স্বাস্থ্যবান যুবক। ব্যায়ামের ফলে শরীরের পেশীগুলি প্রকট হয়ে উঠেছে। দরজা খোলার জন্য ঘরে আলো এসে ঢুকল। যুবকটি আর একটি জানালা খুলে দিলে। ঘরখানি পুরনো আমলের বড়লোকের বাড়ির ঘর। একেলে নয়। আসবাবপত্রও তাই। বিশেষত্ব একটু আছে—দেওয়ালে কুমীরের চামড়া, বাঘের চামড়া এবং বাঘের চামড়ায় মোড়া নকল বাঘ এক কোণে হাঁ করে দাঁড়িয়ে আছে। আর এক কোণে এমনি একটা ভালুক একটা শুকনো ডাল ধরে দাঁড়িয়ে আছে। অন্যদিকে বন্দুক-রাখা র‍্যাকে দু-তিনটি বন্দুক বল্লম তলোয়ার ঢাল ইত্যাদি।

ছেলেটি এসে দাঁড়াল দেরাজের সামনে। উপরের দেওয়ালে দুখানা ছবি। একখানা বিবেকানন্দের আর একখানা নেতাজী সুভাষচন্দ্রের।

তাঁদের প্রণাম করে চলে গেল আর একটা ঘরে।

এবার একটা বড় ক্লক-ঘড়িতে বাজতে লাগল ঘণ্টার ঘড়ি। বাজল ছটা। ঘড়িটার ঘণ্টা ঘোষণার শব্দের মধ্যে বিচিত্র সঙ্গীত-ধ্বনি বাজে।

খোলা জানালা দিয়ে কয়েকটা পায়রা এসে ঘরে ঢুকল, পোষা পায়রা। তারা ঘুরে বেড়াতে লাগল।

ছেলেটি বেরিয়ে এলো পোশাক বদল করে। র‍্যাক থেকে বেছে একটা বন্দুক তুলে নিলে। নলটা খুলে দেখলে আলোর দিকে ধরে। তারপর পরে নিলে কার্টিজের বেল্ট। এক কাঁধে একটা ঝোলা। তারপর বেরিয়ে গেল। আবার ঘড়িতে বাজল পনের মিনিটের গান।

বাড়ি থেকে বেরিয়ে ভোরের জনবিরল পথে হেঁটে চলল। পথে দেখা হল মাত্র জন চার-পাঁচ লোকের সঙ্গে। দুটি বৃদ্ধা জল দিচ্ছিলেন মন্দিরের দরজায়, এক বৃদ্ধ বসে তামাক খাচ্ছিলেন দাওয়ায়, আর একজন তার কাঁধে তরকারি বয়ে নিয়ে যাচ্ছিল।

এক গৃহস্থবাড়ির দরজায় এসে ছেলেটি দাঁড়াল। কড়া নাড়তে লাগল।

বাড়িটি যুবকের পিসতুতো ভাই কালীনাথের।

কড়া নাড়ায় সাড়া না পেয়ে ধাক্কা দিয়ে এবার অনন্ত ডাকলে, কালীদা! ও কালীদা! কালীদা!

পিসতুতো ভাই কালীনাথ তখনও নিদ্রামগ্ন।

বন্ধ দরজা-জানালা ঘরে টেবিলের উপর একটা আলো তখনও জ্বলছে।

খোলা বই একখানা পড়ে রয়েছে পাশেই।

ডাকের সাড়ায় কালীনাথ বার-দুই আড়া-মোড়া ছেড়ে উঠে বসল বিছানার উপর। বসেই রইল।

বাইরের দরজায় ধাক্কা শোনা যাচ্ছে। কালীনাথ সাড়া দিয়ে বলল, কে, অনু? এত ভোরে এসেছিস? বলে উঠে চলে গেল। দরজা খুলে, বাইরের আলো দেখে বললে, আরে, এ যে বেলা হয়ে গেছে!

দরজা খুলতেই অনন্ত বাড়িতে ঢুকে বললে, সাড়ে ছটা বেজে গেছে কালীদা।

—কাঁটা পিছিয়ে দিয়ে সাড়ে পাঁচটা করে দে না!

—তাতে তো বেলা পেছুবে না। কিন্তু এত ঘুমোও কি করে?

—কাল রাত্রি তিনটে পর্যন্ত পড়েছি।

—এত পড় কি করে? কি মধু পাও?

কালীনাথ বললে, ওইটাই ঠিক বুঝতে পারি না।

ও হাসল। হাসতে হাসতেই ঘরে এসে ঢুকল।

অনন্ত গিয়ে টেবিলের বইখানা উল্টে দেখতে লাগল। ঘরের দেওয়াল ঘেঁষে সস্তা দামের আলমারিতে অনেক বই। সবই প্রায় ইংরিজী। পেঙ্গুইন সিরিজ জাতীয় সস্তা সংস্করণের অনেক বই।

অনন্ত একখানা উল্টোতে লাগল। কালীনাথ আলোটা নিভিয়ে দিয়ে বললে, ও তুই বুঝবি নে। বোস্, আমি পাঁচ মিনিটের মধ্যে আসছি। সে চলে গেল মুখ-হাত ধুতে।

অনন্ত ঘরের জানালা খুলে দিল। অগোছালো ঘর। এখানে ওখানে বই পড়ে আছে, কাগজ পড়ে আছে। সিগারেটের কুটি ছড়ানো। অনন্ত এক এক করে বইগুলো তুলতে লাগল। খুলে দেখে বন্ধ করে গুছিয়ে রাখলে। মধ্যে মধ্যে হাসতে লাগল।

কালীনাথ প্রস্তুত হয়ে ঘরে ঢুকল, বললে, ছাখ কাণ্ড, ছাখ। ওসব কি হচ্ছে?

—এইভাবে থাকতে তোমার ভালো লাগে? পার?

—পারি কি না পারি সে তো দেখতেই পাস্। এর থেকে চা তৈরী করলে কাজ হত।

—দেরী হবে কালীদা, চা স্টেশনের স্টলে খাবো চলো। গরম নিম্‌কি সিঙ্গাড়া চা মিষ্টি…

—মিষ্টি তুই খাবি, আমি স্রেফ সিঙ্গাড়া।

টেবিলের উপরের বইখানা তুলে অনন্তের ঝোলায় পুরে দিলে, বললে, চল্!

দুজনেই বেরিয়ে রাস্তায় এসে পড়ল। অনন্ত বললে, আজ কিন্তু শুধু চাঁদমারি না, আজ বধ-পর্ব আছে।

—অর্থাৎ শিকার করবি? পাখী মারবি? উল্লসিত হয়ে উঠল কালীনাথ, সত্যি?

—না, পাখী না। হাসলে অনন্ত, আজ একটা পাগলা কুকুর মারতে হবে। কাল বামুনপাড়া থেকে লোকেরা এসেছিল। একটা কুকুর খেপেছে। কাল সাতজনকে কামড়েছে, তিন-চারটে গরুকে কামড়েছে। সেটাকে না মারলে উপায় নেই।

—ওরে বাবা!

—ভয় কি? আমি তো সঙ্গে রয়েছি।

—হ্যাঁ, ওইটেই যা ভরসা। তুই যতক্ষণ আছিস্ ততক্ষণ যমও আমাকে ছুঁতে পারবে না।

—এত ভয় কেন তোমার বল তো? মৃত্যু অদৃষ্টে যেদিন আছে···

—বকিস নে অনন্ত। অদৃষ্ট-ফদৃষ্ট বাজে কথা, ও আমি মানি না। ঈশ্বরই মানি না তা অদৃষ্ট।

—কেন মানো না বল তো?

—ওই বইগুলো পড়লে তুইও মানতিস না। পাপ-পুণ্য ঈশ্বর-ফিশ্বর স্বর্গ-নরক সব মিথ্যে —বাজে বোগাস্। আঃ, তুই যদি এইগুলো ছাড়তিস অনন্ত, কি ফাইন কাণ্ডটাই করা যেত বল্ তো।

—ফাইন কাণ্ড! পাখী শিকার?

—নিশ্চয়, নিত্য পক্ষীমাংস সহযোগে ভোজনটা কি আরামেই না হত!

—না কালীদা, পাপ হবে বলে পাখী মারি না তা নয়, পাখী মারতে মায়া লাগে। মারো না—বাঘ মারো, ভালুক মারো। দুর্দান্ত জানোয়ার মারতে আমার সে চেহারা দেখলে বুঝতে। এই কুকুরটা মারতে হবে পাগলা হয়েছে বলে, নইলে এসবে আনন্দ নেই।

অনন্তের হাতখানা টিপে কালীনাথ বললে, তুই একটা দৈত্য, দানব!

—'নায়ম্ আত্মা বলহীনেন লভ্য' কালীদা, গীতায় আছে।

—বাজে, নায়মাত্মা বুদ্ধিহীনেন লভ্য, বুঝলি?

সম্মুখেই রেললাইনের বাঁধ। লাইনের উপর দিয়ে সিধু অর্থাৎ সিদ্ধেশ্বর ঘটক আসছে। সে প্রায় আকাশের দিকেই যেন তাকিয়ে আসছে। আধুনিক কালের ঘটক। দিব্য ছিমছাম চেহারা। হাতে একটি ব্যাগ।

এরা দুজনে লোকটির দিকে একবার তাকিয়ে চলে যাচ্ছিল।

ঘটক তাদের দিকে তাকিয়ে দেখে বললে, স্যার, শুনছেন স্যার?

কালী ঘুরে দাঁড়িয়ে বললে, ইয়েস?

অনন্ত বললে, আমাদের বলছেন?

কালী বললে, আমাদের দুজনে ছাড়া আর কেউ থাকলে আছেন পরমাত্মা অনন্ত, উনি পরমাত্মাকে নিশ্চয় ডাকছেন না স্যার বলে!

ঘটক হেসে বললে, নমস্কার স্যার, নমস্কার। ওআণ্ডারফুল বলেছেন স্যার। একেবারে টু দি পয়েন্ট। পরমাত্মাকে আমি ডাকি নি, আপনাদেরই বলছিলাম।

অনন্ত। বলুন কি বলছেন ?

—ওই চিলের ছাদ দেখা যাচ্ছে, আঙুল দিয়ে দেখিয়ে দিলে আকাশের গায়ে সাদা চিলে-কোঠা, ও কার বাড়ি স্যার ?

কালীনাথ বললে, কোথায় বাড়ি আপনার ?

—বাড়ি আমার কলকাতায়।

—এখানে ? জ্যোতিষ-বিদ্যা না ভগ্নীদায় ? পিতৃমাতৃদায় হলে তো গলায় কাছা থাকত।

সিধু ঘটক হেসে ফেললে, আপনার বাক্যবাণ ষটচক্র ভেদ করে লক্ষ্যভেদ করে স্যার। একেবারে অর্জুনের মত তাক্। ধরেছেন ঠিক, তবে ভগ্নীদায় আমার নয়, পরের। আপনি তা হলে কালীনাথবাবু, আর উনি অনন্তবাবু ?

অনন্ত। আপনি আমাদের কি করে চিনলেন ?

কালী। উনি অন্তর্যামী ঘটক-ভগবান, অনন্ত। প্রভু চিন্তাহরণ পরের কন্যা-ভগ্নীদায়ের চিন্তা করে বেড়ান, শুনলে না ? ভোরে স্টেশনে নেমেই আমাদের বিবরণ সংগ্রহ করেছেন, বুঝছ না ? স্টলে নিশ্চয় বলেছে যে, পথেই তাদের দেখা পাবেন—একজন বন্দুক কাঁধে আর একজন এমনি—নাকি চিন্তাহরণবাবু ?

—আমি স্যার সিদ্ধেশ্বর ঘটক, কিন্তু আপনার অনুমান একেবারে টু দি পয়েন্ট !

—তা হলে অনন্ত, তোমার বিয়ে অনিবার্য। স্বয়ং সিদ্ধেশ্বর যেখানে ঘটকালি করছেন, সেখানে বিঘ্নরাজের বাপের সাধ্য হবে না ঠেকাতে।

ঘটক হেসে বললে, আমি স্যার দুজনের বিয়ের সম্বন্ধ নিয়েই এসেছি।

অনন্ত। কালীদার লেখা-পড়া জানা মেয়ে চাই মশাই, মুখ্যু হলে চলবে না, মডার্ন মেয়ে —বুঝেছেন ?

ঘটক। একেবারে টু দি পয়েন্ট মিলিয়ে নেবেন স্যার। চমৎকার মেয়ে। দেখে নেবেন, বাজিয়ে নেবেন। টং করে বেজে উঠবে রাণী-মার্কা টাকার মত। একালের ঢ্যাবা টাকা নয়, খাঁটি চাঁদি।

দূরে ট্রেনের বাঁশী বেজে উঠল।

অনন্ত। ট্রেন ছাড়ল কালীদা, লাইন থেকে নামো।

কালী। যান, তা হলে আপনি কর্তার সঙ্গে দেখা করুন গিয়ে, ওই এক জায়গাতেই দুজনের উচ্ছুগ্যু হবে।

ঘটক। সব জানি স্যার, সব জানি। আপনার গার্জেন ওই মামাই, সব জানি। বি. এ -তে ফিলজফিতে অনার্স, সেকেণ্ড ক্লাস। আর অনন্তবাবু দুটো বাঘ মেরেছেন, শিকারী, ফুটবল চ্যাম্পিয়ান, সব জানি, টু দি পয়েন্ট জানা আছে আমার। আচ্ছা স্যার, নমস্কার।

বলতে বলতেই ট্রেনখানা চলে এলো এবং দু পক্ষের মাঝখান দিয়ে বেরিয়ে গেল। ধোঁয়ার কুণ্ডলী আকাশে পাক খেয়ে ছড়িয়ে পড়ল।

আকাশে ধোঁয়ার কুণ্ডলীর মত কালো বেলে হাঁসের ঝাঁক পাক খাচ্ছিল।

একটা গাছে ঠেস দিয়ে কালীনাথ সেইদিকে তাকিয়ে দেখছিল।

অনন্ত শুয়ে বন্দুক ধরে দূরে একটা মরা গাছের গুঁড়িতে গোল দাগ-দেওয়া জায়গায় লক্ষ্য করছিল।

কালীনাথ ডাকলে, অনন্ত, দেখ্ দেখ্!

—দেখেছি কালীদা!

সে বন্দুকে টোটা পুরতে লাগল। উইনচেস্টার রিপীটার।

—মার্ ভাই ঝাঁকে একটা গুলি। ওই এক গুলিতে যা হয়। কুকুরটা মারতে এলি, তা সেটা তো অন্য লোকেই মেরেছে।

—দূর! চলো, তোমাকে আজ মাংস খাওয়াব। কালীতলা থেকে আনাব।

—ধ্যেৎ!

—কেন?

—পাঁঠার মাংস আর পাখীর মাংস!

অনন্ত আবার বন্দুক ধরে গুলি করতে গেল।

কালীনাথ বললে, মারতেই হবে তোকে, আজ বিয়ের ঘটক এসেছে, তার অনারেও আজ মারতে হবে। না মারবি তো আমাকে দে।

অনন্ত সকৌতুকে বন্দুকটা তার হাতে দিল, নাও।

কালীনাথ বন্দুক তুলে আওয়াজ করলে। একটা পাখীও পড়ল না। অনন্ত হো হো করে হাসতে লাগল।

কালীনাথ বন্দুকটা ফেলে দিলে।

অনন্ত বললে, আরে, ও যে বুলেট।

—বুলেট!

বন্দুকটা তুলে নিলে, তুই বললি নে?

—কি বলব? তুমি তো জানো, ছররার কার্টিজ আমার বেল্টে থাকে না। দাও, বন্দুকটা দাও। চলো, বাড়ি চলো, ওই দেখ, পেয়াদা আসছে।

—মামীমা পাঠিয়েছেন বোধ হয়। হাতের ঘড়ি দেখে সবিস্ময়ে বললে, কিন্তু আজ তো দেরি হয় নি। কি রে প্রহ্লাদ, তুই এত সকাল সকাল আজ?

প্রহ্লাদ পাইক এসে বললে, কর্তা পাঠালেন। বাড়ি চলেন, ঘটক এসেছে, কনে দেখতে যেতে হবে। গিন্নী-মা বলেছেন, আজকালকার ছেলে, নিজেরা দেখে করুক বিয়ে।

কালীনাথ বন্দুক টেনে নিলে অনন্তর হাত থেকে, দে বন্দুকটা দে। মারব, আজ একটা কিছু মারব। কি মারব? ওই পেয়েছি, ওই বেটার কুকুর মার—

অনন্ত। কালীদা!

কালী ততক্ষণে ফায়ার করে দিয়েছে।

দূরে পড়ল একটা কুকুর। সে যাচ্ছিল সামনে দিয়ে।

—করলে কি কালীদা?

কালী আর একটা ফায়ার করে বললে, দেখলি না? একেই বলে কুকুর মারা!

—আমি মুখ্যু, তুমি বিদ্বান—তুমি এত মমতাহীন কেন বল তো?

—মমতা-ফমতা জয় করেছি রে। নইলে লেখাপড়া শিখলাম কেন? ও মিথ্যা মায়া আমার নেই। বিয়ের সম্বন্ধ এসেছে, কনে দেখতে যাব, সেলিব্রেট করে দিলাম, চল্।

দুজনেই উঠে পড়ল। খানিকটা এগিয়ে এসে রেলের লাইনে উঠল। সিগন্যাল ডাউন হয়ে আছে। ট্রেন চলেছে। কামরা থেকে ঘটক মুখ বাড়িয়ে দাঁত মেলে হেসে বললে, অল পাকা স্যারস!

ট্রেন চলে গেল।

ট্রেন এসে থামল একটা স্টেশনে। নামল ঘটক। স্টেশন থেকে বেরিয়ে এসে চড়ল একখানা সাইকেল-রিকশায়।

একটা ফটকওয়ালা বাড়িতে এসে ঢুকল রিকশা।

সামনে বাগান, পুকুর; বড় বাড়ি। বারান্দায় বসে আছেন কর্তা। প্রৌঢ়, পরনে পাজামা-পাঞ্জাবি।

একটা অ্যালসেসিয়ান শুয়ে আছে। সেটা চিৎকার করে উঠল। কর্তা কাগজ পড়ছিলেন, তিনি কাগজ থেকে মুখ তুললেন, চুপ করতে বললেন, ডাকলেন, বেয়ারা! বেয়ারা! আরে এই কে আছিস?

বেরিয়ে এল বই হাতে মীনা, কি বলছ বাপি?

—বেয়ারা গেল কোথায়? কুকুরটাকে নিয়ে যাক। সিধু ঘটক এসেছে, চিৎকার করে জ্বালিয়ে মারবে, ওকে দু চক্ষে দেখতে পারে না।

মীনা এসে কুকুরটার চেন ধরে বললে, আমি নিয়ে যাচ্ছি বাপি!

—বড্ড পাজী হচ্ছে ওটা দিন দিন।

—না বাবা, জ্যাকি দুষ্টু নয়, দুষ্টু তোমার ঘটকটা। জ্যাকি আনকালচার্ড লোক দেখতে পারে না। ঘটকটা যা অসভ্য! আমার কিন্তু বইগুলো আজও এলো না বাবা।

—বই কেনা হয়ে গেছে মামি, আনতে ভুলে গেছি, আপিসে পড়ে আছে।

—সবগুলো পাওয়া গেছে? রবীন্দ্র-রচনাবলীর যে খণ্ডগুলো ছাপা ছিল না, পাওয়া যাচ্ছিল না? 'নূতন-যুগের নারীর প্রশ্ন'খানা?

—সব সব। তিনখানা বেশী বই কেনা হয়েছে!

—কি বই বাবা? নতুন বেরিয়েছে বুঝি? কার লেখা?

—পাকপ্রণালী, গৃহস্থালি, পরিচর্যা।

—কেন, রান্না জানি না বুঝি, না ঘরকন্নার কাজ পারি নে? পড়ি, পড়তে ভালবাসি বলে,

তুমি ভাব আমি ওসব শিখি নি, ভালবাসি নে!

—তবু একবার পড়ে নাও। তোমায় তো দেখতে আসছে। ছেলেটির যখন মা-বাপ নেই, তখন নিজেই আসবে বোধ হয়। হঠাৎ যদি জিজ্ঞাসা করে বসে, সামি-কাবাব, কি মুরগ-মসল্লাম, কি ইলিশ-ভাতে রাঁধতে জানেন? ঠকে যাবে তো!

—আমার পরীক্ষা নেবে নাকি? সেসব উত্তর আমি দেব না।

—তুমিও তাকে জিজ্ঞাসা করবে পাল্টা কোশ্চেন, মোটর চালাতে জানো? ঘোড়ায় চড়তে জানো? সে ঠকে ঠকুক, তুমি ঠকবে কেন?

হাসতে লাগলেন কর্তা পৃথ্বীশবাবু। মীনা চলে গেল কুকুর নিয়ে। কর্তা বললেন, আরে ঘটক এসো, ঝোপের ভেতর থেকে বেরিয়ে এসো, ভয় নেই, কুকুর চলে গেছে।

হাসতে লাগলেন। বাগানের একটা ঝোপ থেকে ঘটক বেরিয়ে এলো।

ঘটক এসে উঠল বারান্দায়।

—ভেরি ফীয়ার্স ডগ স্যার! আর ভারী বদ অভ্যেস, একেবারে বুকে পা দিয়ে দাঁড়াবে। প্রথম দিন তো আমি একদম ধরাশায়ী। ভাগ্যে মা-লক্ষ্মী ছিল, তা নইলে একেবারে কাটথোট। হার্টের প্যালপিটেশন কমতে আমার এক ঘণ্টা লেগেছিল।

—বসো। কি ঠিক করে এলে বল?

—সব ঠিক স্যার, একেবারে টু দি পয়েন্ট!

—বাড়ি-ঘর ভাল?

—খুব ভাল। তবে কি স্যার আপনাদের মত?

—সে তো আমি চাই নে হে। আমার মেয়েরও তা মত নয়। আমি চাই মধ্যবিত্ত ঘর, ভাল ছেলে, পড়াতে অনুরাগ, পণ্ডিত মানুষ। সে নিজের চেষ্টায় বড় হয়ে উঠবে। সঙ্গে সঙ্গে বাড়িও বড় হবে। পুরনো বড় ঘরের দুঃখে আমি সারা জীবন ভুগছি। অনেক কষ্টে পুরনো বাড়ির দরজা ভেঙে আমি নতুন হাওয়া ঢুকিয়েছি।

—এদিকে স্যার টু দি পয়েন্ট মিলে যাবে।

—কিন্তু ছেলের য়্যারিস্টোক্র্যাটিক ম্যানার্স চাই, উচ্চবংশের সহবৎ চাই।

—সেও আপনি ফ্র্যাক্‌শনে ফ্র্যাক্‌শনে, মানে ভগ্নাংশে ভগ্নাংশে মিলিয়ে নেবেন। বিরাট বড় বাড়ির ভাগ্নে যে, সেই বাড়িতেই মানুষ। কথা-বার্তা কি, ঝকমকে তলোয়ার ঘুরছে যেন। এম. এ. পাস, বি. এ.-তে অনার্স। তা ওঁরা কনে দেখতে আসছেন আগামী সপ্তাহে বুধবারে।

—ওঁরা? কে কে? কজন আসছেন?

—দুজন। ছেলের দুই মামাতো ভাই। একজন দাদা আর একজন ভাইও বটে, বন্ধুও বটে—যাকে বলে হরিহর আত্মা। মতে রুচিতে পছন্দে পয়েন্টে পয়েন্টে মিল।

—সে কি, ছেলে? ছেলেকে আসবার জন্যে বলেছিলাম তোমাকে। ছেলে-মেয়ে দুজনেই দুজনকে দেখত।

—কি করব স্যার, টু দি পয়েণ্টের এই একটি পয়েণ্ট কিছুতেই মেলাতে পারলাম না। ছেলের গার্জেন মামা, প্রকাণ্ড জমিদার, রাশভারী মানুষ। তিনি বললেন, সে কি করে হয়? আমি বেঁচে থাকতে সে কেমন করে হবে? গিন্নী মানে ছেলের মামী, তিনি রাজী ছিলেন, জেদ ধরেছিলেন, আপন আপন কনে দেখে আসুক। তা—ঘাড় নেড়ে দিল্ ঘটক, ভেরি হেভী জেণ্টল্ম্যান স্যার, নড়ানো যাবে না।

—ভাল, তুমি হাত-মুখ ধোও। আমাকে বেরুতে হবে এখুনি। ও-বেলা ঠিক করা যাবে যা হয়।

—আমার স্যার শিরে সংক্রান্তি, বেলা বলতে হাতে আর আধঘণ্টা সময়। ট্রেন ধরতে হবে।

—ট্রেন ধরতে হবে!

—আজ্ঞে হ্যাঁ, যেতে হবে বর্ধমান। বর্ধমানের বড় উকিল হরদাসবাবুর বাড়ি। ভদ্রলোকের ভগ্নীদায়। ওই জমিদারবাবুর ছোট ছেলে, মানে যে এখানে মা-লক্ষ্মীকে দেখতে আসছে, তার সঙ্গে সম্বন্ধ হচ্ছে। একেবারে টু দি পয়েণ্ট মিল! ওঁরা চান বনেদী বাড়ির ছেলে। সেই মেয়ে দেখতে যাচ্ছে আমাদের এই পাত্র। দুজনে হরিহর আত্মা মিল তো! তাই কর্তার ব্যবস্থা, ছেলেরাই যদি মেয়ে দেখে তো, এ ওর কনে দেখে আসুক, ও এর কনে দেখে আসুক। হাতে সময় নেই, আজই ছুটতে হবে আমাকে, এক্ষুনি।

—কিন্তু···

—সে হবে স্যার, সে হবে। এর পরই আমি ছেলেকে, বুঝেছেন না, কলকাতায়-টলকাতায় নিয়ে আসব, বুঝেছেন না! তারপর সেখানে কোন বাড়িতে নেমন্তন্ন-টেমন্তন্ন করে দেখা করিয়ে দেব। এ-ও জানবে না, ও-ও জানবে না, আলাপ করবে, বুঝেছেন না। তারপর মেয়েকে বলবেন, মত নেবেন। সে একটা চমৎকার ব্যাপার হবে না স্যার?

—হ্যাঁ, সে কথা মন্দ নয়।

—তা হলে আমি চলি স্যার, এই কথাই রইল। আসছে বুধবার আমি ওদের নিয়ে আসছি।

ঘটক চলে গেল।

কর্তা পৃথ্বীশবাবু নিজের মনেই বললেন, বুধবার। দেওয়ালে টাঙানো ক্যালেণ্ডারে বুধবারে দাগ দিলে।

একখানা গাড়ি এসে দাঁড়াল বারান্দার সামনে। ড্রাইভার একটা বইয়ের প্যাকেট নিয়ে এসে টেবিলে নামিয়ে দিলে।

পৃথ্বীশবাবু প্যাকেটটা দেখেই ডাকলেন, মীনা!

উত্তর এলো না। পৃথ্বীশবাবু নিজেই প্যাকেটটা নিয়ে ঘরে ঢুকলেন। দুটো ঘর পার হয়ে একটা ঘরে এসে ঢুকলেন।

ঘরটা লাইব্রেরী। মীনা অগোছালো বইগুলিকে সাজিয়ে রাখছে।

পৃথ্বীশবাবু বললেন, এই তোমার বই।

মীনা খুশী হয়ে এসে বইগুলি খুলতে শুরু করলে। পৃথ্বীশবাবু বললেন, বুধবার ওরা আসছে, তুমি কিন্তু আমার কথা শুনবে, পাকপ্রণালীটা পড়বে।

চলে গেলেন। মীনা একটু হাসলে। বইগুলি দেখতে লাগল। উপরের বইখানিই পাকপ্রণালী।

অনন্ত ও কালীনাথের গ্রামের স্টেশন-প্ল্যাটফর্ম।

অনন্ত আর কালীনাথ আত্মীয়-প্রবীণদের সঙ্গে পাত্রী দেখতে যাচ্ছে।

প্রবীণ আত্মীয়েরা বসে আছেন বেঞ্চের উপর। দুজন তক্‌মাধারী বেয়ারা আছে। দু তরফে সঙ্গে যাবে। প্রবীণেরা গড়গড়ায় তামাক খাচ্ছেন।

অনন্ত ও কালীনাথ একটু দূরে প্ল্যাটফর্মের ফেন্সিংয়ের গায়ে একটা গাছের তলায় দাঁড়িয়ে আছে। একটা খাতায় কালীনাথ কিছু লিখছে। অনন্ত দাঁড়িয়ে আছে, একটু দূরে এক বৈরাগী বাউল গান গাইছে, তাই শুনছে।

বৈরাগী গাইছে—

ও-আমার মনের রাধায় খুঁজে বেড়াই তিন ভুবনে
তিন-মহলা গোলক-ধাঁধায় লুকায় রাধা কোন্ গহনে ?

গান শেষ হল। অনন্ত এগিয়ে গিয়ে বৈরাগীকে ভিক্ষে দিয়ে এলো। কালীনাথ লেখা থামিয়ে ভুরু কুঁচকে বললে, ওকে পয়সা দিলি কেন ?

—দোষ কি হল ? তুমি কিন্তু অদ্ভুত কালীদা।

—হ্যাঁ, আর তুই হলি একটা আস্ত ভূত !

—কেন, কেমন গান গাইলে বল তো ? রাধা খুঁজতে যাচ্ছি না আমরা ?

—যাচ্ছি ? গাধা কোথাকার ! তুই যাচ্ছিস আমার রাধা খুঁজতে, আমি যাচ্ছি তোর রাধা খুঁজতে। ও বেটা খুঁজছে নিজের রাধা। ওকে পয়সা আমরা দেব কেন ?

অনন্ত হাসতে লাগল।

কালীনাথ বললে, এখন নে, খাতাটা ভাল করে পড়ে নে। সব পরিষ্কার করে লিখে দিয়েছি। ট্রেনে মুখস্থ করে নিবি। একটি একটি করে জিজ্ঞেস করবি।

অনন্ত খাতাটা নিয়ে চোখ বুলিয়ে বললে, কি, এটা কি ? দস্তয়েভস্‌কি ?

—হ্যাঁ, দস্তয়েভস্‌কি। রাশিয়ান লেখক একজন।

—বাব্বাঃ ! এর চেয়ে হিরণ্যগর্ভ যে সোজা কালীদা ! ও-রকম বিদ্‌কুটে নাম বাদ দাও তুমি। বিয়ে করে বউ আনবে, মাস্টার আনবে না। তার জন্যে কি বলে—কি এটা, দ-স্ত-য়ে-ভস্‌কির দরকার কি বল তো ? ও আমি পারব না। হয়তো আমার মুখেই আটকে যাবে। তার থেকে আমি শুক্‌তো রাঁধতে পারে কিনা জিজ্ঞাসা করব। বড় জোর জলধর-চলধর গোছের সোজা নাম থাকে তো বল।

—আচ্ছা আচ্ছা, মোপাসাঁ তো মনে থাকবে, জিজ্ঞেস করবি, মোপাসাঁর লেখা পড়েছেন? যদি বলে পড়েছে, তবে শুধুবি, মোপাসাঁর কোন্ গল্পটা সব থেকে ভাল লাগে, নেকলেস না বল অফ ফ্যাট? ও দুটোই শুই জানিস, ট্রানস্লেশান করে পড়ে শুনিয়েছি তোকে।

—তা শুনিয়েছ। কিন্তু তার চেয়ে বঙ্কিমবাবু শরৎবাবু কতটা পড়েছে জিজ্ঞেস করলে হত না?

—না। আর জিজ্ঞেস করবি, এলিয়ট বড় কবি না রবীন্দ্রনাথ বড় কবি? লিখে দিয়েছি খাতায়, ভুলবি নে!

ওদিকে ট্রেনের ঘণ্টা পড়ল। একজন বেয়ারা ছুটে এলো, গাড়ি আসছে ছোটবাবু!

অনন্ত ছুটে চলে গেল।

*

হরদাসবাবুর বাড়ি। সাজানো ঘর। কনে দেখবার জন্যে একটু বিশেষ পরিচ্ছন্নতা লক্ষ্য করবার মত।

হরদাসবাবু সিগারেট খাচ্ছিলেন এবং একটা ফুলদানিতে কিছু ফুল গুছিয়ে রাখছিলেন। এমন সময় এলেন হরদাসবাবুর মা নিস্তারিণী দেবী। হরদাসবাবু সিগারেটটা পিছনে লুকিয়ে ফেললেন।

নিস্তারিণী দেবী বললেন, ট্রেন তো চলে গেল হরদাস, এঁরা তো এখনও এলেন না!

ঘড়ির দিকে তাকিয়ে হরদাস বললেন, এই তো সাড়ে চারটে মা, চারটে কুড়িতে ট্রেন এসেছে, স্টেশন থেকে আসতেও তো সময় লাগবে।

—বড়ঘরের ব্যাপার বাবা, তাই মনে সন্দেহ হচ্ছে।

—ওইটেই বড়ঘরের বিশেষত্ব মা, কথার খেলাপ করে না। তাছাড়া আমরা বনেদী না হই, আজ তো তোমার আশীর্বাদে তোমার ছেলের কোন অভাব নেই মা। সেদিক দিয়ে তো আমরাও কম যাই না। আমাদের উপেক্ষা—

বাইরে মোটরের হর্ন বাজল।

—ওই, ওঁরা এসে পড়েছেন, যাও, তুমি ভিতরে যাও।

নিস্তারিণী দেবী ঢুকে গেলেন ঘরের দরজা খুলে।

ঘরের মধ্যে সামনে ঠাকুরের সিংহাসনে পটে-আঁকা যুগলমূর্তি, তার সম্মুখে প্রণতা হয়ে রয়েছে ব্রজরাণী। পিছনটা দেখা যাচ্ছে সামনে থেকে। চুল এলো হয়ে সারা পিঠে ছড়িয়ে পড়েছে। নিস্তারিণী দেবী এসে সস্নেহে পিঠে হাত রাখলেন, এবার ওঠ্, ওঁরা যে এসে গেছেন।

বাইরের ঘরে তখন কালীনাথ এবং আত্মীয়েরা এসে বসেছেন। ব্রজরাণী ধীর পদক্ষেপে এসে প্রণাম করলে।

গলা শোনা গেল ঘটকের, মুখ তোল মা, মুখ তোল। ওই প্রণাম ঢের হয়েছে মা। এইবার টু দি পয়েন্ট মিলিয়ে নেবেন স্যার!

ব্রজরাণী ধীরে ধীরে মুখ তুললে।

প্রসন্ন সরল প্রশান্ত একখানা মুখ।

কালীনাথের দৃষ্টি বিমুগ্ধ বিস্ময়ে নিষ্পলক হয়ে গেল।

ঘটক বললে, জিজ্ঞেস-টিজ্ঞেস করুন স্যার!

কালীনাথ। এঁ্যা? হ্যাঁ, আপনার নামটি কি বলুন তো?

নতমুখে ব্রজরাণী বললে, শ্রীব্রজরাণী দেবী।

—ব্রজরাণী দেবী। চমৎকার নাম।

—শুধু তাই নয় স্যার, দেবীতে পর্যন্ত টু দি পয়েন্ট মিল, সাক্ষাৎ দেবী!

—আচ্ছা, রামায়ণ পড়েছেন তো, কাকে সব চেয়ে আপনার ভাল লাগে?

—রামকে।

—রামকে? রাম সীতার অগ্নিপরীক্ষা নিয়েছিলেন, আবার পরীক্ষা নিতে গিয়ে বনবাসে দিলেন, তবু রামকে ভাল লাগে আপনার?

ব্রজরাণী বিব্রত হয়ে চেয়ে রইল। তারপরে বললে, কিন্তু রাম তো সীতাকে প্রাণের চেয়েও ভালবাসতেন। তিনি তো নিজের ইচ্ছায় দুঃখ দেন নি। আর তিনি নিজেও তো কম দুঃখ পান নি। আর—

—বলুন, কি বলছেন?

—রামায়ণে রাম ছাড়া আর কাকে ভাল লাগবে?

ঘটক তাড়াতাড়ি বলে উঠল, কেন মা-লক্ষী—হনুমানকে?

ব্রজরাণী হেসে ফেললে।

ঘটক বললে, দেখুন স্যার, হাসি দেখুন। দেখুন, এ হাসিতে মুক্তো ঝরে স্যার। দেখে নিন।

ব্রজরাণী লজ্জিত হয়ে মাথা নামালে।

কালীনাথ বললে, চমৎকার বলেছেন, রামায়ণে রাম ছাড়া আর কাকে ভাল লাগবে! তবে আমার ভাল লাগে সীতাকে।

ঘটক বলে উঠল, এ মা-লক্ষ্মীটি সাক্ষাৎ সীতা কালীনাথবাবু! তফাৎ শুধু, এ সীতাকে পেতে বরকে ধনুক ভাঙতে হবে না। নাকি স্যার?

কালীনাথ তার মুখের দিকে তাকিয়ে মৃদু হেসে যেন অন্যমনস্ক হয়ে গেল। বললে, তা বটে, ধনুক ভাঙতে হবে না।

এর পরই দেখা গেল, টেবিলের উপর খাতায় কালীনাথ লিখছে, এ সীতাকে পেতে ধনুক ভাঙতে হবে না।

মুহূর্তখানেক পরে কালীনাথ কলম তুলে নিয়ে 'এ' এবং 'না' এই দুটো শব্দ কেটে দিলে।

সে নিজের লেখা ভাল করে পড়লে। মুখে চিন্তাকুল দৃষ্টি। আবার কলম নিয়ে লিখলে, ভাঙতে হবে।

একটু বাইরের জানালার দিকে তাকিয়ে থেকে হঠাৎ একখানা চিঠির কাগজ টেনে নিলে, তারপর লিখলে :

"মহাশয়েষু,

শ্রীযুক্ত হরদাসবাবু, আমি আপনার একজন মক্কেল। আপনি আমাকে একসময়ে জেল হইতে বাঁচাইয়াছেন। সে উপকার আমি ভুলিব না। সেই কারণেই আজ স্বতঃপ্রবৃত্ত হইয়া মহাশয়কে বেনামী পত্রের দ্বারা কিঞ্চিৎ উপকার করিতে চেষ্টা করিতেছি। নাম প্রকাশিত হইলে এখানকার জমিদার হরিহর চট্টোপাধ্যায় আমার ভিটামাটি উচ্ছন্ন দিবেন। হরিহরবাবুর পুত্র অনন্তের সঙ্গে আপনার সীতার মত সুন্দর ভগ্নীটির বিবাহের স্থির করিতেছেন, এ আপনি বানরের গলায় মুক্তাহার পরাইতে উদ্যত হইয়াছেন। অনন্ত বড়ঘরের ছেলে হইলেও ইতর চরিত্র, নেশাখোর, দুর্দান্ত গোঁয়ার এবং বড়লোকের মূর্খ ছেলের সকল দোষেরই আকর। তাহার উপর তাহাদের বাড়িরও এখন পড়ো-পড়ো অবস্থা। মহাশয় বুঝিয়া কাজ করিবেন এই আমার অনুরোধ। ইতি···আপনার জনৈক উপকৃত ব্যক্তি।"

কালীনাথ চিঠিখানা পড়লে।

চিঠিখানা রেখে আর একখানা কাগজ নিয়ে লিখতে আরম্ভ করলে :

"নমস্কারপূর্বক নিবেদন মিদং,

মহাশয়, জনপরম্পরায় জ্ঞাত হইলাম···

বাইরে থেকে ডাকলে অনন্ত, কালীদা!

কালীনাথ চমকে উঠল। তাড়াতাড়ি কলম রেখে, লেখা চিঠি ও খাতা গুটিয়ে তুলে টেবিলের ড্রয়ার খুলে ঢুকিয়ে দিতে দিতে বললে, অনু!

—হ্যাঁ, তোমার কনে চমৎকার কালীদা!

কালীনাথ তার মুখের দিকে স্থিরদৃষ্টিতে চেয়ে রইল, বললে, চমৎকার! সত্যি বলছিস অনু?

—সত্যি বলছি, কালীদা, খাসা মেয়ে!

—তোর পছন্দ হয়েছে?

—হ্যাঁ, তা হয়েছে। চমৎকার লেগেছে আমার।

—তুই আমাকে বাঁচালি অনু!

—ওঃ, তোমার বুঝি উদ্বেগে ঘুম হচ্ছিল না?

হেসে ফেললে কালীনাথ। বললে, বললাম যে, তুই আমাকে বাঁচালি! কিন্তু তোর পায়ে ব্যাণ্ডেজ কেন রে?

—ওঃ, সে এক কাণ্ড কালীদা। তোমার হবু বউকে রক্ষা করতে গিয়ে এই কাণ্ড। পায়ে চোট লেগে গেল সামান্য।

—সে আবার কি?

—সে আর বলো না। ওদের বাড়িতে গিয়ে পৌঁছে দেখি, বাড়িতে হুলুস্থুল কাণ্ড।

কি ব্যাপার, না ঘরের মধ্যে তোমার হবু বউকে সাপে আগলেছে।

—সাপে ?

—হ্যাঁ গো, পুরনো বাড়ি, সামনে পিছনে মস্ত বাগান। গাছের ডাল বেয়ে জানালা দিয়ে এক প্রকাণ্ড গোখরা ঢুকেছিল ঘরে।. ঘরটা লাইব্রেরী ঘর, আলমারিতে বোঝাই। তোমার কনে লাইব্রেরীতে ঢুকে একটা আলমারির দরজা খুলতে গেছে, অমনি শব্দ পেয়ে তিনি গর্জন করে নির্গত হয়েছেন। মেয়েটি লাফিয়ে উঠে পড়েছে টেবিলের উপর। এদিকে ঠিক সাপটা দরজার মুখে, কেউ ঢুকতে পারছে না, চেঁচামেচি করছে। আসল কথা কি জান, ভয়েই অস্থির সকলে। বন্দুক, লাঠি—কিন্তু ঢোকে কে ? আমি দেখে-শুনে বন্দুকটা হাত থেকে নিয়ে চলে গেলাম পিছন দিকের জানালায়। একটা শিক টেনে ছাড়িয়ে—

ঘটনাটা শুনতে শুনতে যেন কালীনাথের চোখের সামনে ভেসে উঠল সবটা ছবির মত :

পৃথ্বীশবাবুর বাড়ির লাইব্রেরী ঘর, দরজার মুখে অনেক লোক ভিড় করে রয়েছে। ভিতরে টেবিলের উপর মীনা দাঁড়িয়ে আছে। টেবিল ও দরজার মধ্যে মেঝের উপর একটা সাপ ফণা তুলে দাঁড়িয়ে দুলছে, গর্জন করছে।

ওদিকে পিছনের জানালার শিক বেঁকিয়ে বন্দুক হাতে অনন্ত ঢুকে ঘরের মধ্যে লাফিয়ে পড়ল। বললে, দরজার মুখ থেকে সকলে সরে যান, আমি গুলি করব, ছর্‌রা ছুটে যেতে পারে।

সঙ্গে সঙ্গে দরজার মুখ খালি হয়ে গেল।

অনন্ত গুলি করলে। সাপটা পড়ে গেল।

অনন্ত হেসে মীনাকে বললে, এবার নামুন টেবিল থেকে, ধরব ?

মীনা সলজ্জভাবে বল্‌লে, না, নিজেই নামছি আমি। কিন্তু ওটা যে এখনও নড়ছে।

—নড়ুক। ফণাটা ভেঙে গেছে।

বলেই এগিয়ে এসে লেজ ধরে সাপটাকে তুলে নিয়ে বেরিয়ে এলো।

বারান্দায় পৃথ্বীশবাবু প্রমুখ লোকজন সবিস্ময়ে দেখলেন। পৃথ্বীশবাবু এগিয়ে এসে বললেন, ফেলে দাও, ওটা ফেলে দাও বাবা, হাত ধোও। বেয়ারা, জল সাবান নিয়ে আয়। ওঃ, ইউ আর এ ব্রেভ ল্যাড, সত্যকার সাহসী ছেলে তুমি! আমি খুব খুশী হয়েছি।

অনন্ত নিজেই সাপটাকে দেখছিল। সে ফেলে দিলে সাপটা সামনের মাঠে ছুঁড়ে।

এই সময় বেরিয়ে এলো মীনা।

বললে, এঃ, আপনার পা কেটে গেল কি করে ?

অনন্ত তার দিকে ফিরে তাকিয়ে হেসে নিজের পায়ের দিকে তাকিয়ে দেখলে, গোড়ালির কাছে খানিকটা কেটে গেছে, রক্ত ঝরছে।

দেখে বললে, বোধ হয় জানালা দিয়ে ঢুকবার সময় কেটে গেছে।

পৃথ্বীশবাবু ব্যস্ত হয়ে বললেন, ইস, এ যে বেশ কেটেছে!

অনন্ত। না সামান্য, ও কিছু না।

—না-না-না, সামান্য নয়। মীনা, টিঞ্চার-আইডিন নিয়ে এসো, পরিষ্কার ন্যাকড়া নিয়ে এসো। যাও যাও।

গল্পটা শেষ করে অনন্ত হাসি-হাসি মুখে কালীনাথের দিকে চাইলে।

কালীনাথ হেসে বললে, তাহলে তো তুই রামের মত ধনুক ভেঙে এসেছিস রে!

—হ্যাঁ, তোমার হয়ে। লক্ষ্মণ রামের হয়ে ধনুক ভেঙেছে বলতে পার।

—আমি কিন্তু তোমার কনে দেখে খুব খুশী হই নি অনু।

—কেন, মেয়ে তো শুনলাম দেখতে ভাল!

—সে তো মাটির পুতুলও দেখতে ভাল, মানুষের চেয়ে অনেক সুন্দর।

—আমিও তো কালীদা ওই কাদা-মাটির মতই মানুষ, সোনা তো নই, সে তুমি।

—না অনু, তুই সোনার চেয়েও দামী রে, তুই হীরে, মানিক। রুপোতে বসালেও তোর দাম কমে না, সোনাতে বসালেও তোর দাম বাড়ে না। তোর মধ্যে খাদ নেই। আমার খাদ আছে।

চুপ করে বিষণ্ণ দৃষ্টিতে তাকিয়ে থাকল কালীনাথ।

অনন্ত বললে, তুমি যে মুষড়ে গেছ কালীদা!

—একটু গেছি।

—কিন্তু এতে আর তুমি কি করবে বল?

—তোকে ঠকাব অনু?

—যার উপরে তোমার হাত নেই, সেখানে তোমার দোষ কি বল?

দীর্ঘনিশ্বাস ফেলে কালীনাথ বললে, ঠিক বলেছিস, যার উপর আমার হাত নেই, তার জন্য আমার দোষ কি! নাঃ, দোষ নেই।

চুপ করে আবার বসে রইল বাইরের দিকে তাকিয়ে।

অনন্ত বললে, চললাম এখন কালীদা। তুমি কেমন হয়ে রয়েছ!

—শরীরটা ভাল নেই রে।

—খুব খেয়েছ বুঝি?

কালীনাথ আবার হাসলে; বললে, ও-বেলা আবার আসিস।

—আসব। বলে অনন্ত চলে গেল।

কালীনাথ একটু চুপ করে বসে থেকে, আবার কাগজ বের করে লিখতে বসল। চিঠি লিখে গেল।

চিঠি শেষ করে পড়ে দেখল একবার। চিঠিতে লেখা আছে:

"নমস্কারপূর্বক নিবেদন মিদং.

মহাশয়, জনপরম্পরায় জ্ঞাত হইলাম যে, মহাশয় অত্র গ্রামের জমিদার বাটীর ভাগিনেয় কালীনাথ চট্টোপাধ্যায়ের সহিত নিজ কন্যার বিবাহের সম্বন্ধ স্থির করিতেছেন। মহাশয়দের বংশ-পরিচয় এবং খ্যাতি আমার সুবিদিত বলিয়া জানাইতেছি যে, কালীনাথ শিক্ষিত অর্থাৎ

এম. এ. পাস করিলেও শিক্ষার কোন গুণ তাহার মধ্যে নাই। নিতান্তই হা-ঘরে স্বভাব, ঘরের অবস্থাও হীন, চরিত্রের দিকও তাই। বাল্যকাল হইতেই চুরি অভ্যাস আছে। স্কুলে সহপাঠীদের বই চুরি করিত। এখনও বন্ধুদের কাছে টাকা ধার করিয়া পরিশোধ করে না। কোন ধর্ম মানে না। নাস্তিক। জ্ঞাতার্থে মহাশয়কে নিবেদন করিলাম। যাহা বিবেচনা হয় করিবেন। ইতি—

জনৈক শুভার্থী"

এই চিঠি যথাসময়ে পৃথ্বীশবাবুর হাতে পৌঁছিল। তিনি চিঠিখানা পড়া শেষ হলে আবার একবার চোখ বুলিয়ে গেলেন। তারপর পকেটে রাখলেন, উঠলেন, গম্ভীরভাবে পায়চারি করতে লাগলেন।

হঠাৎ অ্যালসেসিয়ানটা ডেকে উঠল।

পৃথ্বীশবাবু ধমক দিলেন, এই চুপ, চুপ!

তারপর সামনে তাকিয়ে দেখলেন ঘটক আসছে। ডাকলেন, রামলাল!

রামলাল আসতেই বললেন, নিয়ে যা ওটাকে।

রামলাল নিয়ে গেল। ঘটক এসে নমস্কার করে বললে, তা হলে স্যার, সবই যখন টু দি পয়েণ্ট মিলে গেল, তখন···

—না।

সবিস্ময়ে ঘটক বললে, স্যার!

—পড়, এই চিঠি পড়।

ঘটক চিঠি পড়লে। তারপর বললে, সব বাজে স্যার, সব বাজে।

—বাজে! কেন লোকে বাজে চিঠি লিখতে যাবে?

—যায় স্যার, যায়। হরদাসবাবুর বাড়িতে ঠিক এমনি পত্র!

—তুমি চুপ কর, সন্দেহ যখন হয়েছে, তখন বিয়ে আমি দেব না!

—বেশ তো চলুন, পাত্র দেখে এনকোয়ারী করে পয়েণ্ট বাই পয়েণ্ট মিলিয়ে নেন।

—তার থেকে···

—বলুন স্যার!

—শোন, তার থেকে তুমি—দাঁড়াও, অবনীশ! অবনীশ!

—বাবা! বলে পৃথ্বীশবাবুর বড় ছেলে বেরিয়ে এলো।

—আচ্ছা, অনন্ত ছেলেটি, যে দেখতে এসেছিল মীনাকে, তাকে কেমন লাগল তোমার?

—সুন্দর ছেলে! ব্রেভ, স্ট্রং, ভদ্র—শুধু এর মুখেই যা শুনলুম, লেখাপড়া করে নি···

ঘটক বলে উঠল, করেছে স্যার, করেছে। পাস না করলে কি হবে, বাড়িতে পড়েছে। বুঝেছেন না, পাড়াগাঁয়ের জমিদার-বাড়ি তো, সেকেলে ঢঙ্। ইংরেজী সংস্কৃত অঢেল পড়েছে। বিনয় দেখলেন না? বিদ্যা দদাতি বিনয়ং। টু দি পয়েণ্ট মিলিয়ে নেন।

অবনীশ বললে, তা হতে পারে, বিচিত্র কিছু নয়। মীনাকে যা প্রশ্ন করলে সব, মোপাসাঁর নাম করলে, এলিয়টের কথা জিজ্ঞাসা করলে···

পৃথ্বীশবাবু বললেন, হুঁ, পড়, চিঠি পড়।

অবনীশের হাতে দিলেন, দিয়ে বললেন, বল কি করব?

অবনীশ। চিঠিখানা পাত্রের অভিভাবকের কাছে পাঠিয়ে দিন না।

—না, যে লিখেছে সে বিপদে পড়বে। তারা সেখানকার জমিদার। তার থেকে যদি অনন্তর সঙ্গে বিয়ের সম্বন্ধ করি?

ঘটক। খুব ভাল হবে স্যার, খুব ভাল হবে। বড় দীঘির মাছ বড় দীঘিতে গিয়ে পড়বে। সত্যি বলতে কি কালীনাথের অবস্থা এদের বা আপনাদের তুলনায় তো দীঘির কাছে গোষ্পদ। টু দি পয়েন্ট মিলে যাবে।

—তাই কর ঘটক। ছেলে দেখেছি, ছেলে-মেয়ে পরস্পরকে দেখেছে, তাই কর অবনীশ, তাই আয়োজন কর।

বিয়ের শানাই বেজে উঠল।

আলোকোজ্জ্বল বিয়েবাড়ি। পাত্রের অন্দর। উলু পড়েছে।

কয়েকজন কুটুম্বিনী কথা বলছেন, কি কাণ্ড মা, কনে বদল হয়ে বিয়ে!

—ভবিতব্য ভাই, একেই বলে যে যার হাঁড়িতে চাল দিয়েছে।

—ঠিক বলেছ, তা নইলে এরা চাইলে পাসকরা পাত্র, ওরা চাইলে বনেদী বাড়ি, শেষে মত বদলে এরা দিলে একটাও পাস-না-করা অনন্তর সঙ্গে বিয়ে, ওরা দিলে মামার বাড়ির ভাগ্নে কালীর সঙ্গে বিয়ে!

—না হে না, আসল কথা হাল-আমলের কাণ্ড!

—তাহলে ভাণ্ডটা ভাঙি হাটের মাঝখানে? কনেরা পছন্দ করেছে! এ কি ভাই আমরা যে চোখ বুজে শুভদৃষ্টি? এ মেয়ে অনন্তকে দেখে ভুলেছে, ও মেয়ে কালীকে দেখে ভুলেছে, তারপর গোসা-ঘরে খিল দিয়েছে। কি? না, ওই যে দেখতে এসেছিল, তাকে ছাড়া বিয়ে করবে না।

একটি মেয়ে ছুটে এলো।

—ওগো, অনন্তদার বউ কি চমৎকার গান গাইছে গো!

—তাই নাকি?

—এসো, এসো, শুনবে এসো।

—আমরা যাব? লজ্জা করবে না তো?

—লজ্জা? অনন্তদার বউ একেবারে মডার্ন মেয়ে। সে তোমার কালীদার বউ, একেবারে চুপ করে বসে আছে। যেন একরাশ সাদা পদ্মফুলের গোছা, কথা নেই, শুধু একটু মিষ্টি গন্ধ উঠছে।

—চুপ কর্ ছুঁড়ি, এখুনি গিন্নী শুনবে।

—সত্যি বলছি তো, মিথ্যে তো বলছি না।

—বললে কি হবে, অনন্তর বউ বেটার বউ না ?

—বেশ চুপ করলাম। এখন এসো, গান শুনবে এসো।

একটি সাজানো ঘরে দুই বউ বসে আছে। চারিদিকে তরুণীদের ভিড়।

মীনা গান গাইছে :

সুন্দর মম গৃহে আজি পরমোৎসব রাতি !

ব্রজরাণী একপাশে বসে মুগ্ধ হয়ে শুনছে। মধ্যে মধ্যে ঘোমটা খসে পড়ছে। সে তুলে নিচ্ছে।

আর একখানা ঘরে কালীনাথ এবং অনন্ত বসে ছিল।

গানের সুর ভেসে আসছিল।

কালীনাথ বললে, তুই ভাই জিতে গেলি অনু। ওঃ, তোকে যদি দেখতে না পাঠাতাম রে !

অনন্ত হেসে বললে, দোহাই কালীদা, আমাকে দোষ দিও না। তারপর হঠাৎ গম্ভীর হয়ে বললে, আর বউদিকে তো দেখলাম কালীদা, উনি স্বর্গের দেবী। ওঁকে পেয়েছ, তোমার ভাগ্যের আর সীমা নেই। তুমি যদি নিজেকে···

—না না অনু, ওটা তোকে আমি ঠাট্টা করে বলছিলাম। আমি সুখী হয়েছি, আমি সুখী হয়েছি।

ওদিকে গান থামল। বাইরে শানাইয়ের বাজনা শোনা যেতে লাগল শুধু।

এ ঘরে তখন ভিড় কমেছে।

মীনা এবং ব্রজরাণী বসে আছে। মেয়েরা ফুলের মালা পরিয়ে দিচ্ছে।

ওদিকে শাঁখ বেজে উঠল। একটি মেয়ে এসে বললে, এসো গো বউদিরা, এসো, ফুলশয্যার সময় হয়েছে।

বাইরে তখনও বাজনা বাজছে।

পথে পড়ল অনন্তর সেই ঘর—শিকারের জন্ত সাজানো, বন্দুক ইত্যাদি সাজানো।

ব্রজরাণী থমকে দাঁড়াল।

—উঃ, বাঘটা যেন সত্যি জ্যান্ত বাঘ !

সঙ্গিনী বললে, আমাদের ছোট দাদাবাবু মেরেছে ওই বাঘটা, ওই ভালুকটা।

মীনা প্রশ্ন করলে, লাইব্রেরী কোন্‌টা ?

—লাইব্রেরী ?

—হ্যাঁ, পড়বার ঘর ?

মেয়েটি সবিস্ময়ে তার দিকে তাকিয়ে রইল, তা আমি জানি না।

বাইরে উলু পড়ল।

একজন প্রবীণা এলেন, এসো এসো নাত-বউয়েরা, এমন ঠাণ্ডা পায়ে হাঁটলে কি চলে ? ক্ষণ চলে যাবে যে, এসো।

সুসজ্জিত ফুলসজ্জার বাসরে অনন্ত দাঁড়িয়ে আছে।

প্রবীণা মীনাকে নিয়ে ঘরে ঢুকে বললেন, এই নাও ভাই, মহাবীর অর্জুন, তোমার সুভদ্রা নাও। যা কাণ্ড হ'ল—কনে বদল ! এ একরকম সুভদ্রাহরণ। নে ভাই, একবার বাঁয়ে নিয়ে দাঁড়া, দেখি।

মীনা ঘুরে দাঁড়াল।

অনন্ত হেসে বললে, ও-সব এ যুগে চলে না ঠাকুমা।

—তবে আর কি করব ভাই, চলি, দরজা বন্ধ কর্ তুই। বাড়ির ফচকে মেয়েগুলো যা ছিঁচকে, একটু সাবধানে কথা ক'স ভাই।

প্রবীণা চলে গেলেন। অনন্ত দরজা বন্ধ করে ঘুরে দাঁড়াল।

মীনা বললে, তোমাদের এখানকার মেয়েরা কি সেকেলে, কি যে সব যা-তা বলে, বিচ্ছিরি !

অনন্ত হাসলে, কেন, কি বললে ?

—এই তো, এই ঠাকুমা না কে বললেন, সুভদ্রাহরণ, শুনলে না ? হরণ কি ? ছিঃ।

—ও তো আমাদের পুরাণের কথা।

—পুরাণে থাকলেই বুঝি হরণ কথাটা ভাল ?

—আচ্ছা, এবার শিখিয়ে দেব, রূপকথার রাজপুত্রের মত অজগর বধ করে রাজকন্যা জিতে এনেছি।

মীমা এবার হাসল, বললে, চমৎকার, উঃ, বাঘটা যা দেখলাম !

—এক গুলিতে মেরেছিলাম।

—কিন্তু তোমার লাইব্রেরী কোথায় ?

—লাইব্রেরী ?

—হ্যাঁ, বাইরে বুঝি ? কিন্তু সে তো আর চলবে না, ঘরে আনতে হবে।

অনন্ত স্তব্ধ হয়ে গেল।

—তুমি পড়বে, আর আমি পড়ব না বুঝি ? আমি অনেক পড়তে চাই। তুমি জানো না, মূর্খতাকে আমি ঘৃণা করি।

অনন্ত বিবর্ণ হয়ে গেল এবার। বললে, কিন্তু লাইব্রেরী তো আমার নেই।

—নেই ? চুপ করে গেল মীনা। আকস্মিক আঘাতে যেন স্তব্ধ হয়ে গেল।

—না, পড়াশোনা বেশী করি নি আমি। সে তো তোমরা জানো। পড়তে আমার ভালই লাগে না।

মীনা চিৎকার করে উঠল, তাহলে তুমি আমাদের ঠকালে কেন ?

—মীনা, কি বলছ ?

—ঠিকই বলছি। ঘটক বললে…(সে ছুটে গিয়ে বিছানায় মুখ গুঁজে পড়ল।)

অনন্ত স্তব্ধ হয়ে রইল কিছুক্ষণ।

স্তব্ধ ঘরের খোলা জানালায় এসে দাঁড়াল। এবার শুনতে পেলে, কালীনাথ ও ব্রজরাণীর মৃদু কথাবার্তার শব্দ।

কালীনাথ বলছে, মনে থাকবে তো তোমার নিজের কথা, রামায়ণে রাম ছাড়া আর কাকে ভাল লাগবে, সীতাকে প্রাণের চেয়ে ভালবাসতেন বলেই তিনি তাকে দুঃখ দিতে পেরেছিলেন !

ব্রজরাণীর কথা শোনা গেল, এ কথা কি ভোলা যায় ?

—জানো তো, এটা আমার নিজের বাড়ি নয় ? আমার বাড়ি গরীবের বাড়ি, ভাল লাগবে তো ?

—সেই তো আমার বাড়ি। শিব শ্মশানে থাকেন, গৌরীর সেই হ'ল রাজ-অট্টালিকা।

মধ্যে মধ্যে বাইরে একটা গাছের মাথায় একটা প্যাঁচা ডেকে মৃদুস্বরের কথা ঢেকে দিচ্ছিল। অনন্ত সেই দিকে রূঢ় দৃষ্টিতে তাকিয়ে হঠাৎ বন্দুকটা নিয়ে শব্দ করে গুলি ছুঁড়লে।

বাইরে বাজনা থেমে গেল।

কালীনাথ চিৎকার করে বললে, কি হ'ল ?

মীনা চমকে উঠে বসল।

বাইরের দরজায় ধাক্কা পড়ল।

অনন্ত দরজাটা খুললে। সামনে দাঁড়িয়ে মা, কালীনাথ, আরও কজন।

—কি হ'ল অনু ?

—একটা কাল-পেঁচা, চিৎকার করছিল, গুলি করে মেরেছি। সর, পথ দাও।

—কোথা যাবি ?

—মাথার ভিতরে অসহ্য যন্ত্রণা। মাথাটা ধোব।

বিছানায় বসে রইল মীনা। মুখ যেন তার বিবর্ণ শীর্ণ হয়ে গেছে।

মীনা পিত্রালয়ে ফিরে এসেছে।

ফুলশয্যার রাত্রের সেই মুখ, সেই দৃষ্টি।

কেউ যেন প্রশ্ন করলে তাকে, ইস্, এ কি তোর চেহারা হয়েছে মীনা ?

তার মুখ দেখে তাকে প্রশ্ন করলেন তার মা।

মীনা ঘরের মধ্যে দাঁড়িয়ে আছে। পাশে তার বাক্স ইত্যাদি নামানো রয়েছে। আরও বয়ে আনা হচ্ছে।

কুটুম্বিনীরা দাঁড়িয়ে আছে। মীনা মায়ের প্রশ্নের কোন জবাব দিল না।

মা এগিয়ে এসে কপালে হাত দিয়ে প্রশ্ন করলেন, অসুখ-বিসুখ করে নি তো ?

মীনা মায়ের বুকে মুখ গুঁজে দিলে।

—মীনা

মীনা কাঁদতে লাগল।

মা বললেন, যাও, যাও, তোমরা একটু সরে যাও সব, শুনছ?

একজন বললে, আগে অষ্টমঙ্গলার করণগুলো সারুন।

মা ধমক দিয়ে বললেন, সে হবে। তোমাদের যেতে বলছি, যাও এখন। যাও।

সকলে এবার চলে গেল।

—মীনা!

মুখ লুকিয়ে রেখেই মীনা জবাব দিলে, তোমরা আমাকে শেষে একজন মূর্খ বড়লোকের ছেলের হাতে সঁপে দিলে মা!

—কি বলছিস মীনা?

—হ্যাঁ, মা।

মা এবার দু' হাতে ঠেলে মীনাকে সামনে সোজা করে দাঁড় করালেন, বললেন, মীনা!

—ক্লাস নাইন পর্যন্ত পড়ে পড়া ছেড়েছে। শিকার করে, বাঘ-ভালুক মেরে বেড়ায়, নিত্য সকালে উঠে চাঁদমারি করে। বাড়িতে শুধু বন্দুক তলোয়ার ঢাল বারবেল মুগুর। একখানা বইয়ের সঙ্গে সম্বন্ধ নেই।

—কিন্তু ঘটক যে বললে···

—মিথ্যে, মিথ্যে, সব মিথ্যে!

—ঘটক নয় মিথ্যে বললে, কিন্তু তোকে দেখতে এসে···

—সে সব ওর পিসতুতো ভাই খাতায় লিখে দিয়েছিল, ও মুখস্থ করে এসেছিল।

আবার সে মায়ের বুকে মুখ লুকিয়ে কাঁদতে লাগল।

মা তার পিঠে হাত বুলিয়ে ডাকলেন, রামলাল!

রামলাল এসে দাঁড়াল।

—বাবুকে ডেকে দাও। বলো যেন এক্ষুনি আসেন।···আয়, এখন হাত-মুখ ধুবি চল্। তা এর জন্যে কি, অনন্ত নতুন করে পড়াশুনা করুক, ভাল মাস্টার রেখে পড়ুক।

অনন্ত বাইরে চুপ করে বসে রয়েছে। তার বড় শালা অবনীশ রয়েছে। গুটিদুয়েক ছোট ছেলে-মেয়ে ঘুর ঘুর করছে।

অবনীশ বকে যাচ্ছে। অনন্ত বিষণ্ণতার মধ্যে স্তব্ধ।

অবনীশ বলছে, আমার একজন বন্ধু আছেন, বেশ বড় শিকারী। প্রতি বছর শীতে হাজারিবাগ কিংবা তরাই, কি আসামে শিকারে যাবেনই। মোটর-টোটর নিয়ে বেশ আয়োজন করে যান। আপনার সঙ্গে আলাপ করিয়ে দেব, মিলবে ভাল আপনাদের। ভদ্রলোক মাচায় বসে বাঘ মারেন, তাঁবুতে এসে বই পড়েন। বিজনেসম্যান তো, এমনিতে

পড়াশুনা করার সময় হয় না, ওই শিকারে গিয়ে পড়ে ফেলেন একগাদা বই।

হেসে হাতের সিগারেটটা ঝাড়তে লাগল।

ঠিক এই মুহূর্তে একটি ছেলে এসে একখানা বই অনন্তর হাতে দিলে, পড়ুন জামাইবাবু।

অনন্ত বইখানার দিকে তাকালে—তারপর তাকালে ছেলেটির দিকে।

অবনীশ বইখানা নিয়ে দেখে বললে, শর্ট স্টোরিজ অফ্ মোপাসাঁ। মোপাসাঁ তো আপনার ফেবারিট, এ্যাঁ?

অনন্ত সোজা হয়ে বসল। বললে, মোপাসাঁর গল্প দু-তিনটে বাংলায় আমি পড়েছি অবনীশ-বাবু, কিন্তু ইংরিজী আমি পড়ি নি। ইংরিজী আমি ভাল জানি না।

—জানেন না? সে কি?

—হ্যাঁ এবং তার জন্যে আমি লজ্জাবোধও করি না। ছেলেটির দিকে চেয়ে বললে, বইটা তুমি নিয়ে যাও। হাসলে সে—তিক্ত হাসি।

ঠিক এই সময়ে প্রবেশ করলেন পৃথ্বীশবাবু এবং তাঁর স্ত্রী।

অবনীশ উঠে দাঁড়াল, অনন্তও দাঁড়াল। দুজনকেই প্রণাম করলে—আগে শাশুড়ীকে।

পৃথ্বীশবাবু বললেন, আবার কেন, একবার তো করেছ!

অনন্ত। কিন্তু এই তো নিয়ম আমাদের।

পৃথ্বীশবাবু। নিয়ম-টিয়মের বাহুল্যগুলোকে ছেঁটে দাও। একালে একালের মানুষ হও। এখন শোন, আমি কলকাতায় যাচ্ছি। কলকাতার বাসায় তোমার থাকবার ব্যবস্থা করছি আমি। তোমার বাবাকেও লিখছি। আমার ইচ্ছে কলকাতায় থেকে তুমি ভাল করে পড়াশুনা কর। অবশ্য লেখাপড়া তুমি জানো না এ বলছি না আমি, কিন্তু আরও শেখো, আরও পড়।

অনন্ত হঠাৎ উদ্ধতের মত মাথাটা তুলে দাঁড়াল।

মীনার মা তার হাতখানি ধরে বললেন, এসো বাবা, ভেতরে এসো, ও-সব কথা পরে হবে।

একখানি ঘরের মধ্যে তাকে বসালেন। টেবিলের উপর জলখাবার সাজানো রয়েছে। শাশুড়ী বললেন, বসো, জল খাও।

ওদিকে নজর পড়তেই জলের গ্লাসটি তুলে নিয়ে বললেন, কি কাজ এদের, জলটা আঢাকা দিয়েছে। বেয়িয়ে গেলেন।

বাইরে মেয়ের হাতে জলের গ্লাস দিয়ে বললেন, ভাল করে হাসিমুখে কথা বলবি, অনুরোধ করবি, মিনতি করবি। বলবি, আমার উপর তুমি রাগ করো না, আমার দুঃখটা তুমি বোঝ, আমার অন্য জামাইবাবুরা কত বিদ্বান, তাদের কাছে আমার লজ্জা ঘোচাতে হবে। বুঝলি? ছি, জল মোছ্। যা।

মীনার চোখ থেকে জল গড়িয়ে পড়েছিল। মা মুছিয়ে দিলেন, ঘরের দরজায় এগিয়ে দিলেন।

মীনা ঘরের মধ্যে ঢুকে গেল। মা অপেক্ষা করে রইলেন। একটা কিছু পড়ে গেল, শব্দ হ'ল। মা বললেন, ফেললি তো জলের গ্লাসটা ?

ঘরে ঢুকলেন। দেখলেন, মীনা দাঁড়িয়ে আছে বিবর্ণমুখে। হাতের গ্লাসটা পড়ে গেছে। ঘর শূন্য অর্থাৎ অনন্ত নেই। শুধু খাবার পড়ে আছে।

কালীনাথের বাড়িতে বাড়িঘর সাজানো হয়েছে।

সংসার পেতেছে তারা। অর্থাৎ কালীনাথ ও ব্রজরাণী।

শোবার ঘরে কালীনাথ দাঁড়িয়ে মাথা আঁচড়াচ্ছে।

বাইরে থেকে ব্রজরাণীর মৃদু কণ্ঠস্বরে গানের সুর ভেসে আসছে—

সুন্দর মম গৃহে আজি পরমোৎসব রাতি !

কালীনাথ কান পেতে শুনে হাসলে।

তারপর চিরুনি রেখে পাশের ঘরের দরজা খুলে বেরিয়ে পড়ল, টেবিলের উপর ফুলের মালা ছিল, একগাছি তুলে নিলে। বেরোল গাইতে গাইতে—

তব কণ্ঠে দিব মালা—দিব চরণে ফুল-ডালা
আমি সকল কুঞ্জ কানন ফিরি এসেছি যুথী জাতি—

পাশের ঘরটি তার পড়ার ঘর।

এখানিও চমৎকার পরিচ্ছন্ন। জানালায় দরজায় পর্দা। আসবাব দামী নয় কিন্তু সুন্দর। তারও চেয়ে সযত্ন পরিচ্ছন্নতার পরিচয় বড়।

গাইতে গাইতেই কালীনাথ ঘরখানি অতিক্রম করে গেল। এবারে এলো উঠানে।

একদিকে রান্নাঘর ভাঁড়ারঘর—ওদিকে কুয়া বাথরুম ইত্যাদি। কুয়াটিকে ঘিরে সুন্দর ফুলের গাছ। পরিচ্ছন্ন তকতকে উঠান।

ভাঁড়ারঘরের দাওয়ায় বসে ব্রজরাণী ফল কাটছিল।

সে সহাস্যে কালীনাথের দিকে তাকিয়ে মুখ নিচু করলে।

কালীনাথ এসে মালাটি গানের লাইনের সঙ্গে ব্রজরাণীর গলায় পরিয়ে দিলে।

ব্রজরাণী লজ্জায় মুখ ফেরাতে গিয়ে বঁটিতে হাত কাটলে। যন্ত্রণায় বলে উঠল, উঃ !

—কাটলে তো হাত ?

—একটু কেটে গেল।

—দেখি, দেখি, এই বুঝি একটু ?

আঙুলটি মুখে পুরতে গেল।

—ছাড়ো ছাড়ো···

—তুমি জানো না, মুখে অমৃত আছে। বলে পকেটের রুমাল বের করে ছিঁড়ে বাঁধতে লাগল কালীনাথ।

বাইরে কেউ ডাকলেন, বউমা !

ব্রজরাণী বললে, ছাড়ো ছাড়ো, মামীমা এসেছেন। তুমি পালাও, ঘরে যাও।

সে খাটির উপর থেকে উঠে দাঁড়াল।

কালীনাথ পালাতে পালাতে ইশারা করে বললে, মালা—মালাটা!

ব্রজরাণী মালাখানি খুলে তার দিকে ছুঁড়ে দিয়ে এগিয়ে গেল বাইরের দরজার দিকে।

দরজা খুলতেই ঢুকল অনন্তর মা।

—ও-বেলা খবর পাঠাও নি, ভাল আছ তো?

—ভুলে গেছি মামীমা। আমার ওই দোষ, বড্ড ভুলে যাই।

—এ বয়সের ঐ ধর্ম মা। তোমরা সুখে থাকো। সেইটুকু শুনলেই আমরা খুশী।

—ঠাকুরপো কদিন আসছেন না কেন মামীমা?

—কি জানি মা, কিছু বুঝতে পারছি না। হঠাৎ শ্বশুরবাড়ি থেকে চলে এলো, বললে, এমন শরীর খারাপ হ'ল যে থাকতে ভরসা হ'ল না। তাছাড়া তোমাদের জন্য মনটাও কেমন করে উঠল। সেখানে না বলে চলে এসেছি, একটা চিঠি লিখে দাও। ···সেই থেকে কেমন হয়ে গেছে। কি যে করে ঘরে বসে!

—মীনাকে আনছেন না কেন?

—সে আবার ওঁরা বলেন, এখন কিছুদিন এখানে থাক্। কর্তা বলেন থাক্, দ্বিরাগমন এক বছর পরেই তো হয় চিরকাল। কালীনাথের নয় সংসারে লোক নেই, অনন্তর তো তা নয়। আসল কথা বুঝতে পারছি না মা, কত্তায়-কত্তায় চিঠি চলছে। কি চিঠি তা জানি না।

—ঠাকুরপোকে পাঠিয়ে দেবেন, বলবেন, আমি বলেছি।

—বলব।

অনন্ত তার ঘরের মধ্যে স্তব্ধ হয়ে দাঁড়িয়ে আছে। খাটের উপর কয়েকখানা খোলা বই। ওদিকে দেওয়ালে অস্ত্র-শস্ত্র। একটা দ্বন্দ্বের মধ্যে পড়েছে। অকস্মাৎ বইগুলিকে বন্ধ করে দিল এবং বন্দুক তুলে নিয়ে কার্টিজ বেল্ট পরে বেরিয়ে পড়ল।

বাইরে এসে পড়তেই শুনতে পেল বাবার কণ্ঠস্বর, ক্রুদ্ধ কণ্ঠস্বর তাঁর, এ আমি ক্ষমা করব না, কখনও না।

মায়ের কণ্ঠস্বর শোনা গেল, চুপ কর, ঘরের কেলেঙ্কারি—ছি!

বাবার শয়নঘরে কথাবার্তা হচ্ছিল। কর্তা পায়চারি করতে করতে বললেন, অনন্ত লেখাপড়া শেখে নি কিন্তু সে অমানুষ নয়, কেলেঙ্কারি কিসের?

—কিন্তু পুত্রবধূও তো তোমারই পুত্রবধূ!

—ভুল করেছি। নিজে না দেখে না বুঝে ওখানে বিবাহ দিয়ে ভুল করেছি। নতুন পাখা গজালে এমনি হয়, আকাশে উঠে মাটিকে মাটির মানুষকে তুচ্ছই ভাবে। আস্পর্ধা দেখ, লিখেছে অনন্ত অপদার্থ। শুধু তাই নয়, পড়ে দেখ কি লিখেছে—আমাকে লিখেছে প্রতারক।

—সে কি, কি বলছ তুমি ?

—পড়ে দেখ। পত্র দিলেন।—পড়ো, আমরা নাকি মূর্খ ছেলের বিবাহ দেবার জন্য কালীনাথের নামে অপবাদ দিয়ে বেনামী চিঠি দিয়েছি। আমি বেনামী চিঠি লিখেছি ? আমি এ চিঠির উত্তর দেব না। তুমি বেয়ানকে চিঠির জবাব লিখে দাও, কন্যাকে যেন সেখানেই রাখেন তাঁরা।

তিনি ঘর থেকে চলে গেলেন বেরিয়ে। অন্য দরজা দিয়ে ঘরে ঢুকল অনন্ত।

—মা ?

—অনন্ত !

—দেখি পত্রখানা।

মা তার হাতে দিলেন পত্র। অনন্ত পড়লে।

শেষাংশে লেখা : 'প্রমাণস্বরূপ বেনামী পত্রখানিও এই সঙ্গে পাঠালাম। আমার দৃঢ় বিশ্বাস, এ বেনামী পত্র আপনার ইঙ্গিতক্রমেই লেখা হয়েছিল। ইতি—

পৃথ্বীশ চট্টোপাধ্যায়

মা বললেন, তোর আমি আবার বিয়ে দেব বাবা।

অনন্ত কথার উত্তর না দিয়ে তাড়াতাড়ি খামখানার ভিতর হাত পুরলে, বের করে আনলে সেই বেনামী পত্রখানা।

মা প্রশ্ন করলেন, ওখানা ?

বেনামী চিঠিখানা।

—দেখি !

পত্রখানা খুলেই অনন্ত চমকে উঠল।

—অনন্ত ?

অনন্ত পত্রখানা মুড়ে পকেটে পুরলে।

—দেখি পত্রখানা, দে।

না। সে বাইরের দিকে অগ্রসর হ'ল।

—অনন্ত !

—না-না-না। হঠাৎ ঘুরে দাঁড়িয়ে বললে, পত্রখানা আমিই লিখিয়েছিলাম মা, ওদের দোষ নেই।

—তুই লিখিয়েছিলি !

—হ্যাঁ মা, আমিই লিখিয়েছিলাম।

সে বেরিয়ে চলে গেল। গ্রামের পথ ধরে হেঁটে চলল।

নিস্তব্ধ দ্বিপ্রহর। পথের ধারে গাছতলায় একটি সাঁওতাল মেয়ে শুয়ে আছে। মাথার শিয়রে বসে একটি সাঁওতাল যুবক নিজের মাথায় গোঁজা কৃষ্ণচূড়ার ফুল খুলে তার মাথায়

পরিয়ে দিচ্ছে।

অনন্ত থমকে দাঁড়াল।

মেয়েটা হেসে বললে, কি দেখছিস বাবু? উ আমার বর বটে!

অনন্ত হাসল। আবার চলল।

পুরুষটি ডাকলে, বাবু!

—কি বলছিস?

—ফুল লিবি বাবু?

—কি করব নিয়ে?

—তুর বউকে দিবি। চুলে পরায়ে দিবি।

—না, আমার বউ নেই।

মেয়েটি উঠে বসে বললে, হ, সি দিন যি তুর বিয়া হ'ল।

—বউ বাপের বাড়ি আছে।

—তবে, তবে এগুলো তু নিজে লে, আমাদিগে চারটে পোয়সা দে, না হয় এখুনি আমাদিগে পোয়সা দে!

—তাই নে! হেসে সে পয়সা দিলে। তারপর চলতে গিয়ে হঠাৎ দাঁড়িয়ে বললে, দে, ফুলটা দে।

ফুল নিলে হাতে করে; এসে উঠল কালীনাথের দরজায়। কড়ায় হাত দিয়ে থমকে দাঁড়াল।

মৃদু গানের সুর কানে এলো:

সুন্দর মম গৃহে

ঘরের ভিতরে কালীনাথ বিছানায় শুয়েছিল। তার মাথায় চুলে আস্তে আস্তে আঙুল চালাচ্ছিল ব্রজরাণী এবং ওই গান গাইছিল:

সুন্দর মম গৃহে

হঠাৎ থেমে ব্রজরাণী বললে, এপ পরটা কেমন হবে দেখিয়ে দাও না, কিছুতেই ঠিক হয় না আমার—

হেসে কালীনাথ দ্বিতীয় কলি ধরলে। কালীনাথ বউকে রবীন্দ্র-সঙ্গীত শেখাচ্ছিল।

কালীনাথের অনেক কল্পনা, অনেক স্বপ্ন—বউকে লেখাপড়া শেখাবে, গান শেখাবে। আরও কত! জীবনের সুখকে সে মধুর থেকে মধুরতর করে তুলবে। মনে মনে গুন্‌গুন্ করে, "মধুর তোমার শেষ যে না পাই!" তৃতীয় কলি দুজনে গাইলে।

ঠিক এই সময়ে দুপুরের বাতাসে হঠাৎ জানালাটা খুলে গেল। সামনের ব্রাকেট থেকে একটা ফুলদানি গেল পড়ে।

ব্রজরাণী বলে উঠল, ওই যা! সে উঠতে গেল।

ভ্রূ কুঞ্চিত করে কালীনাথ প্রথমটা চমকে উঠল। কোথা থেকে যেন বাধা পড়ে, কে

যেন এই স্বপ্ন দেখার মধ্যে চকিত করে দেয়। মুহূর্তে আত্মসম্বরণ করে ব্রজরাণীর আঁচল চেপে ধরলে কালীনাথ, না। মানবে না সে এই বাধাকে। সে নিরীশ্বরবাদী। তার তো অট্টহাস্য করা উচিত। কপালে তার ভ্রূকুটি দেখা দিল।

—দেখছ না জানালা খুলে গেছে?

—যাক্।

বাইরে কড়া নড়ে উঠল।

কালীনাথ ভ্রূ কুঞ্চিত করে বললে, এই দেখ, এই দুপুরে কে এলো আবার, রূঢ়স্বরে হাঁকলে, কে?কে? কে?

অনন্তর গলা শোনা গেল, কালীদা!

—অনু!

কালীনাথ যেন কেমন হয়ে গেল। স্তিমিত, অবসন্ন, অনড়। মুখ তার পাংশু হয়ে গেল। বার বার সে মাথা নেড়ে বলে উঠল, না-না-না!

ব্রজরাণী বিস্মিত হ'ল, কি? কি না? কি বলছ? ঠাকুরপো এসেছেন,-যাও, দরজা খুলে দাও।

সে তাড়াতাড়ি বাইরে চলে গেল।

হ্যাঁ, সম্বিৎ ফিরে এলো কালীনাথের, বললে, তুই যে আর এদিক মাড়াসই না অনু, আয় আয়।

বেরিয়ে গিয়ে দরজা খুলে দাঁড়াল।

অনন্ত হেসে বললে, এলে খুশী হও কিনা সত্যি বল দেখি!

কালীনাথ হেসে উঠল। হাত ধরলে তার।

অনন্ত বললে, তোমাদের আনন্দ-কূজনে ব্যাঘাত করব?

—তোর বউদি কত নায করে তোর। বলে, আমাদের নতুন সংসারে ঠাকুরপো এলেন না! আমারও মনে হয়, অনুর হয়তো ভাল লাগে না আমাদের সংসার, হয়তো—

চুপ করে গেল সে।

ব্যস্ত হয়ে অনন্ত বললে, দোহাই কালীদা, তোমায় হিংসে আমি করি না!

দীর্ঘনিশ্বাস ফেলে কালীনাথ বললে, সে আমি জানি।

—মায়ের মুখে শুনেছি বউদির গুণের কথা। বউদি আসবার জন্যে বলেছিলেন, কিন্তু···

—ওঃ, তাই এসেছিস, দাদার টানে নয়?

—না, সত্যিই তোমার টানে। একটা জিনিস দিতে এসেছি তোমাকে।

—কি?

অনন্ত পকেটে হাত দিয়ে কি ভাবলে, তারপর বের করলে কৃষ্ণচূড়া ফুলের স্তবকটি, নাও, বউদির খোঁপায় পরিয়ে দিও। আর···

হঠাৎ পত্রখানা বের করে হাতে দিয়ে বললে, এই চিঠিখানা!

—কি চিঠি ?

—একখানা বেনামী চিঠি। বিয়ের আগে আমার শ্বশুরকে কে এখান থেকে লিখেছিল, তিনি আবার বাবাকে পাঠিয়ে দিয়েছেন, দেখো তো, একটু খোঁজ করো তো কে লিখেছে।

বলেই সে ফিরল।

কালীনাথ বিবর্ণ মুখে দাঁড়িয়ে রইল।

ঠিক সেই মুহূর্তেই ব্রজরাণী পিছন থেকে বললে, ঠাকুরপো !

ব্রজরাণীর হাতে জলখাবারের থালা। কালীনাথ তার দিকে তাকালে। দরজার মুখে অনন্তও ফিরে তাকালে।

ব্রজরাণী কণ্ঠস্বর উচ্চ করে ডাকলে, না-না, না খেয়ে যেতে পাবেন না ঠাকুরপো।

অনন্ত বললে, বউদি, তুমি স্বর্গের দেবী, তোমার হাতের খাবার যে অমৃত, কি বল কালীদা ?

কালীনাথ বললে, আমার মাথাটা কেমন করছে অনু, আমি শোব গিয়ে; কিন্তু তুই না খেয়ে যাস নে ভাই।

অনন্ত ঘরে বসে খাচ্ছিল। কালীনাথ শুয়ে আছে জানালার দিকে মুখ ফিরিয়ে।

ব্রজরাণী জলের গ্লাস এনে রাখলে টেবিলের উপর।

একটি রেকাবীতে রাখলে পান। বললে, আমার একটি কথা রাখতে হবে ঠাকুরপো ?

—বলুন।

—আমি এবার ব্রত নেব। সাবিত্রী ব্রত। আপনাকে আমার ব্রাহ্মণ হতে হবে।

—ওরে বাপরে ! না বউদি, মুখ্যু বামুন বামুনই নয়। আমি পারব না।

—না ঠাকুরপো, আমি স্বপ্নে দেখেছি, আপনাকে ব্রাহ্মণ করেছি।

—কি সর্বনাশ, গায়ত্রী-টায়ত্রী সব ভুলে গেছি যে ! (জল খেয়ে গ্লাস নামিয়ে বলল) আর এক গ্লাস জল আনুন বউদি।

ব্রজরাণী চলে গেল।

অনন্ত বললে, কালীদা ?

—অনু !

—শরীর কি তোমার এখনো খারাপ করছে ? ওঠো ওঠো, ও কিছু না। তোমার মন এত দুর্বল ? দূর, ওঠো ওঠো।

ব্রজরাণী এলো জল এবং কাঁধে তোয়ালে নিয়ে।

জল নামিয়ে দিয়ে বললে, আর একটা কথা ঠাকুরপো…

—বলুন। গায়ত্রী আমি করি, সেদিকে আমি বামুন, কিন্তু পৈতে ময়লা। তা পৈতেতেও নিত্য সাবান দিয়ে ধবধবে রাখব। আর কি করতে হবে বলুন ?

—মীনাকে নিয়ে আসুন।

কালীনাথ হঠাৎ উঠে বসল। বললে, আমি তোকে একটা কথা বলব ?

—বল্।

—তুই রোজ সকালে আমার কাছে এক ঘণ্টা করে পড়্ অনু।

অনন্ত উঠে দাঁড়াল, না কালীদা, ও পারব না।

বেরিয়ে এলো ঘর থেকে।

—অনু! অনু!

অনন্ত ফিরে দাঁড়িয়ে বললে, তোমার মত হতে আমি পারব না কালীদা। মরে গেলেও পারব না। ও তুমি আমায় বলো না। ঈশ্বর-না-মানা পণ্ডিত হওয়া কি সোজা কালীদা? ও আমি পারব না। বাংলা লেখাপড়া তো জানি, বঙ্কিম-রবীন্দ্রনাথ পড়েছি, নাই পড়লাম ইংরেজীর মোটা বইগুলো, থাক্!

বলেই চলে গেল সে!

অনন্ত বেরিয়ে যেতেই ব্রজরাণী সরল ভাবেই বললে, ঠাকুরপো, ঠাকুরপো, বাঃ বেশ লোক তো আপনি, পড়ার ভয়ে পাঠশালা-পালানো ছেলের মত পালিয়ে যাচ্ছেন যে ঠাকুরপো?

সে অনন্তর পিছনে পিছনে বেরিয়ে গেল বাড়ির বাইরের দরজা পর্যন্ত।

ঘরের মধ্যে একা কালীনাথ তারই লেখা সেই চিঠিখানি খুললে। তারপর মাথা হেঁট করলে।

একটি বিচিত্র শব্দ উঠল, টক্-টক্-টক্।

কালীনাথ মাথা তুলে তাকালে, খুঁজলে শব্দের উৎসস্থান।

আবার শব্দ উঠল, টক্-টক্-টক্।

এবার চোখে পড়ল একখানা ফটোগ্রাফ, তার ও ব্রজরাণীর। সেইটের পাশে দেওয়ালে বসে আছে একটা বড় টিকটিকি!

সে দেওয়ালের কোণ থেকে টেনে নিলে একটা চাবুক। তুললে চাবুক। মারলে। ঝন ঝন শব্দে ছবিখানা ভেঙে পড়ে গেল। টিকটিকিটা কিন্তু মুহূর্তে দেওয়াল বয়ে উঠে কোন্ বরগার ফাঁকে অদৃশ্য হয়ে গেল।

ঠিক এই সময়ে বাইরে অনন্ত চিৎকার করে উঠল, শয়তান! বদমাশ!

ব্রজরাণী চিৎকার করে কালীনাথকে ডাকলে, ওগো!

ছুটে এলো ব্রজরাণী, ওগো, ঠাকুরপো একজন কাবুলিওলার সঙ্গে মারামারি করছে গো, শিগগির এসো!

কালীনাথ ছবিখানার দিকে তাকিয়ে ছিল, সে বললে, ছবিখানা ভেঙে গেল, আমি নিজেই ভাঙলাম।

ব্রজরাণী বললে, ও তো কাচ লাগালেই হবে। এখন শিগগির এসো, এই লম্বা-চওড়া জোয়ান কাবুলীওলা—

দীর্ঘনিশ্বাস ফেলে আত্মসম্বরণ করে কালীনাথ বললে, আঃ, অনুর ওই দোষ, রাগলে জ্ঞান থাকে না!

ব্রজরাণী বিবর্ণ মুখে বললে, উঃ, সে যে কী মূর্তি হয়েছে ঠাকুরপোর, সে তোমাকে কি বলব? আমার সমস্ত শরীরটা ভয়ে থর থর করে কেঁপে উঠল। উঃ বাপ রে, এমন ভাল মিষ্টি মানুষ কি করে যে এমন হয়ে গেলেন!

তখন বাইরে রাস্তার উপরে চারিপাশে লোক জমেছে।

ভিড়ের মধ্যে থেকে কেউ বললে, ছোটবাবু উঠুন, ছাড়ুন ছাড়ুন, আর না।

—ছোটবাবু!

কালীনাথ ছুটে এলো, ডাকলে, অনু, অনু!

সকলে তাকে পথ ছেড়ে দিলে।

ভিতরে দেখা গেল, অনন্ত একজন কাবুলীওয়ালার বুকের উপর বসে রয়েছে, তার গায়ের জামা ছিঁড়ে গেছে, তার দেহের প্রতিটি পেশী যেন ফুলে উঠেছে, মাথার চুল এলোমেলো হয়ে গেছে, গায়ের কয়েকটা জায়গা ছড়ে গেছে।

পথ খালি হতেই কালীনাথ ভিতরে ঢুকতে গিয়ে থমকে দাঁড়াল। সে যেন শঙ্কিত হ'ল, একটা আতঙ্ক তাকে আচ্ছন্ন করে দিল। কি ভীষণ—কি ভয়ঙ্কর অনু!

অনন্ত উঠে দাঁড়াল। কাবুলীটাকে বললে, আর কখনও এমন কাজ করতে যেও না, তোমাকে সাবধান করে দিলাম।

কাবুলীটা উঠে দাঁড়াল। সে বেশ মার খেয়েছে। সে বললে, হামারা রূপীয়াকো ক্যা হোগা বাবু?

—পাবে তুমি। দেবে ও। কই সে? নীলমণি!

একজন বললে, নালমণি? নীলু গ্যাঁজাল? সে তো ছুটে পালিয়েছে ছোটবাবু! অনেকক্ষণ।

অনন্ত। পালিয়েছে? হতভাগা কোথাকার, নির্লজ্জ বেহায়া, টাকা ধার করবার জায়গা পায় না! আচ্ছা, এসো তুমি, আমি তোমায় টাকা দেব।

কালী। অনু, দাঁড়া।

অনন্ত। কালীদা!

হাসলে একটু।

কালী। ছি-ছি-ছি, আয়, ভিতরে আয়। ছড়ে রক্ত পড়ছে, গায়ে ধুলো লেগেছে, জামা ছিঁড়ে গেছে।

অনন্ত। নাঃ, বাড়ি চললাম, ওকে টাকা দিতে হবে। নীলুর গলায় গামছা বেঁধে নিয়ে যাচ্ছিল, আমি ছেড়ে দিতে বললাম তো আমাকে বললে, তুমকো ভি মারেগা ডাণ্ডা। রাগ হয়ে গেল। এখন ওর টাকাটা দিতে হবে বৈকি।

আবার ও হাসলে।

কালী। আমি দিচ্ছি টাকা, আয়, এমন করে যায় না। তোর বৌদি ডাকছে। তারপর তার একটা হাত ধরে বললে, ছি, এমন রাগ, তা হলে—। স্তব্ধ হয়ে গেল কালীনাথ।

উঃ, কি প্রচণ্ড রাগ তোর !

অনন্ত মাথা নেড়ে বললে, উঃ, মাথার মধ্যে একটা আগুনের শিখা যেন এখনও ঘুরপাক খাচ্ছে। কি জানি—হঠাৎ—এক মুহূর্তে—চলো, মাথাটা ধুয়ে ফেলবো।

অনন্ত কালীনাথের বারান্দায় বসে মাথা ধুচ্ছিল।

ব্রজরাণী তোয়ালে নিয়ে দাঁড়িয়ে ছিল। অনন্ত উঠে দাঁড়ালে ব্রজরাণী তোয়ালে হাতে দিল। সে মাথা মুছলে। ব্রজরাণী বললে, একটু হাওয়া করব ঠাকুরপো ?

অনন্ত। না-না বউদি, কোন দরকার নেই, রাগ আমার চলে গেছে।

ব্রজ। উঃ, কি জোর আপনার গায়ে, আর কি রাগ ! ভয়ে যে আমার কি হচ্ছিল, সে…

অনন্ত। আমাকে মাফ করবেন বউদি, আমাকে আপনি মাফ করবেন। বলেই সে প্রায় ছুটে পালিয়ে গেল।

কালীনাথ ঘরের ভিতর থেকে ডাকলে, অনু !

ব্রজরাণী ঘরের ভিতরে এসে বললে, ঠাকুরপো ছুটে পালিয়ে গেল।

কালীনাথ চুপ করে দাঁড়িয়ে রইল।

ব্রজরাণী বললে, আমি কিছু বুঝতে পারছি না, আমার আজ বড় ভয় লেগেছে বাপু !

কালীনাথ একটু চুপ করে থেকে হঠাৎ বললে, তুমি মীনাকে একটা চিঠি লিখবে রাণী ? সে আসুক। এখানে আসুক। লিখবে ?

ওদিকে মীনা নতুন করে জীবন আরম্ভ করবার সংকল্প নিয়ে পড়া শুরু করেছে, গান শিখছে। বাপ তাকে সমর্থন করেছেন। কিন্তু তবু যেন জীবনের সব সুর একটি সূক্ষ্ম বেসুরের সঙ্গে মিশে সব গোলমাল করে দিচ্ছে।

সেদিন তার সঙ্গীত-শিক্ষয়িত্রী তাকে গান শেখাচ্ছিলেন। হঠাৎ মীনা থেমে গেল।

শিক্ষয়িত্রী বললেন, এমন ভাবে কি করে গান শেখাব আপনাকে ? আপনি তো একটুও মন দিচ্ছেন না !

মীনা চমকে উঠে অপ্রস্তুত হয়ে বললে, আমার শরীরটা কেমন ভাল নেই।

—তবে আমি আজ যাই ?

—না-না, আমি এবার মন দিচ্ছি। আপনি শুরু করুন। শিক্ষয়িত্রী একটি গান ধরলেন। মীনা অর্গানের ধারে দাঁড়াল। কিছুক্ষণ পরে আবার জানালার কাছে এসে দাঁড়াল।

শিক্ষয়িত্রী তাঁর গান শেষ করলেন।

মীনার মা এসে ঘরে ঢুকলেন। একখানা পত্র তার হাতে দিয়ে বললেন, তোর চিঠি।

মীনা চিঠিখানা নিয়ে তাকিয়ে রইল। মীনার মা শিক্ষয়িত্রীকে বললেন, আজ আর থাক,

ওর শরীরটা কদিন থেকে ভাল নেই।

মীনা পত্রখানা নিয়ে চলে গেল অন্য ঘরে।

পত্রখানা খুললে সে। ব্রজরাণীর পত্র।

মীনা ভাই,

আমি তোমার দিদি ব্রজরাণী। চিনেছ তো! তুমি ভাই অবিলম্বে এখানে চলে এসো, দেরি করো না। নইলে বোধ হয় ঠাকুরপো পাগল হয়ে যাবে। আশীর্বাদ ভালবাসা রইল।

ইতি—

ব্রজরাণী

বাইরে শোনা গেল মীনার বাবার কণ্ঠস্বর, সিধু ঘটককে পেলে আমি চাবুক মেরে পিঠের চামড়া তুলে দেব। দেখ, মীনার শ্বশুর কি চিঠি লিখেছে দেখ, অনন্ত রাজী হইলে আমি আবার তাহার বিবাহ দিতাম। তাহাই হইত আপনার পত্রের প্রত্যুত্তর। যাহা হউক, বধূমাতাকে অবিলম্বে এখানে পাঠাইয়া দিবেন। ইহাই আমার শেষ পত্র।

মা বললেন, জামাইকে তুমি আসতে লেখো। বেয়াইকে ক্ষমা চেয়ে চিঠি দাও।

বাবা বললেন, না, মীনাকে আমি পাঠাব না। শিখুক, ও লেখাপড়া শিখুক।

—না, তা হয় না।

বাবা বললেন, ছেলেকে তিনি পাঠাবেন না বলে লিখেছেন।

মা বললেন, তবু মীনাকে যেতে হবে। যাবে সে। মীনা!

তিনি ও-ঘরে গিয়ে ঢুকলেন।

—মীনা!

পত্র হাতে মীনা মায়ের দিকে তাকাল।

মা কাছে এসে পত্রখানা টেনে নিতে নিতে বললেন, কার চিঠি? অনন্তর?

মীনা ঘাড় নেড়ে জানালে, না।

মা পড়তে লাগলেন।

মীনা বললে, আমি যাব না। আমাকে তোমরা পাঠিও না।

মা তার দিকে তাকিয়ে বললেন, তোকে যেতে হবে মীনা।

মীনার পিত্রালয়ে মীনা ঘরে বসে পড়ছিল।

বেশভূষার পারিপাট্য নেই। মুখে একটি বিষণ্ণতার ছাপ, কিন্তু তার সঙ্গে রয়েছে একটা নিষ্করুণ কাঠিন্য।

সামনে টেবিলের উপর একখানা পত্র পড়ে রয়েছে। বই পড়ার মধ্যে কয়েকবার সেই পত্রের দিকে তাকিয়ে বই রেখে পত্রখানা নিয়ে খুলে ফেললে। পত্রখানি অনন্তর।

"আমি মূর্খ বলিয়া তোমার মনের দুঃখ এবং রাগ আমি জানি। তোমার মাকে তুমি যে বলিয়াছিলে, তোমাকে জলে ফেলিয়া দেওয়া হইয়াছে, সে আমি সেদিন নিজের কানেই শুনিয়া

আসিয়াছি। কিন্তু তোমাকে বিবাহ করিবার জন্য আমরা তোমাদের প্রতারণা করিয়াছি, এ কথা সত্য নহে। মা-কালীর শপথ করিয়া বলিতে পারি—"

পত্রখানা সে আর না পড়ে হাতের মধ্যে মুঠো করে ধরে রইল। চেয়ে রইল সামনের দিকে।

এমন সময় মীনার এক ভাই এলো ছুটে। এসেই তার হাত চেপে ধরলে, ওঠো, ওঠো দিদি।

—আঃ, রণ্টু!

—জামাইবাবুরা দিদিরা সবাই লনে বসে আছেন। তোমাকে ধরে নিয়ে যাবার হুকুম আমার উপর—জীবিত অথবা মৃত!

—ছাড় বলছি, ছাড় রণ্টু!

এমন সময় দরজার ওপাশ হতে কণ্ঠস্বর শোনা গেল, Hey—who's that? Who's that brute! নারী-কণ্ঠে আর্তধ্বনি? কে বর্বর করে নিপীড়ন?

ঘরে প্রবেশ করল মীনার এক ভগ্নীপতি। নিখুঁত সাহেবী পোশাক-পরা ভদ্রলোক, আরে, আরে, ভাই-বোনে লেগেছে লড়াই, মাই গড! বিচিত্র ভঙ্গি করে দাঁড়ালেন।

মীনা হেসে ফেললে, বললে, দেখুন না রণ্টুর পেজোমি!

—আমি কি করব? জামাইবাবুই তো বললেন ধরে নিয়ে এসো—জীবিত কি মৃত! হাত ছেড়ে দিয়ে সরে দাঁড়াল সে।

এরই মধ্যে কখন মীনার হাত থেকে পত্রখানা পড়ে গিয়েছিল। মীনার ভাই সেই চিঠিখানার দিকে লোলুপ দৃষ্টিতে তাকালো।

জামাইবাবু বললেন, আমি যদি তোমাকে লাঙ্গুলে অগ্নিসংযোগ করে ঘরে লাগাতে বলি, মূর্খ, তাই করবে তুমি?

—Then sir, you are a traitor!

—ইয়েস স্যার, ভগ্নীপতিরা চিরকালই তাই। আই মিন শ্যালকদের কাছে। কিন্তু শ্যালিকাদের কাছে আমরা অনুগত বংশবদ না-কি বশংবদ কি বলে না—সেই রকম ভক্ত। দেবী, ভক্তের কথা রাখো, এসো, আমরা সকলেই তোমার জন্য প্রতীক্ষা করছি।

মীনা হাসলে। বললে, চলুন।

—এই তো! তোমার কণ্ঠের সঙ্গীত ভিন্ন চায়ের আসরটি আমাদের সাজানো বাগান শুকিয়ে যাওয়ার মত হয়েছে।

এই অবসরে ছেলেটি পত্রখানা কুড়িয়ে নিয়ে অন্য দরজা দিয়ে ছুটে পালিয়ে গেল।

সে ছুটতে ছুটতে এলো লনে, চায়ের আসরে।

লনে মীনার দুই দিদি, অপর ভগ্নীপতি, বউদিদি বসে ছিলেন।

গান গাইছিলেন এক দিদি। কেউ ঘাড় নাড়ছিলেন, কেউ কেউ নিজেদের মধ্যে কথা বলছিলেন।

ছেলেটি দিদির কানে কানে কথা বলে পত্রখানা হাতে দিল। দিদি বউদিদি ঝুঁকে পড়ল পত্র পড়তে।

পড়া শেষ করে মুখে রুমাল দিয়ে হাসতে লাগল।

অন্য জামাইবাবুর হাতে দিল পত্রখানা।

এই সময়েই গান শেষ হ'ল।

জামাইবাবুটি পড়তে পড়তে বলে উঠলেন, ওরে বাপ রে, এ যে দেখি নিগমানন্দ স্বামী। মাই গড্! মা কালী জানেন, আমি ইংরাজী লেখাপড়া শিখি নাই, কিন্তু অধার্মিক নই, আমার প্রবৃত্তি হীন নয়, চরিত্র নীচ নয়। ইংরাজী না শিখিলেই অশিক্ষিত হয় না। আমি বাংলা জানি। বাংলা পড়ি। ঈশ্বরে বিশ্বাস রাখি। কিন্তু তোমরা তাহা পছন্দ কর না—

এই সময় দেখা গেল মীনা ও সেই জামাইবাবু আসছেন।

দিদি বললে, চুপ করো, মীনা আসছে।

মীনা এসে বসল। বসেই বললে, কি, আমায় দেখে আলোচনা বন্ধ হ'ল কেন তোমাদের?

ভাইটা বলে উঠল, মা কালীর শপথ করিয়া বলিতে পারি, তোমার পত্রখানি আমি দিয়াছি বটে কিন্তু পড়িতে বলি নাই!

মীনা চমকে উঠল। পরমুহূর্তেই বললে, দাও, আমার চিঠি দাও।

দিদি পত্রখানা হাতে এগিয়ে দিল। মীনা তার সঙ্গের জামাইবাবুর হাতে পত্রখানা দিয়ে বললে, পড়ুন জামাইবাবু, আমার লাভ-লেটার পড়ুন। ভাগ্য, কোষ্ঠী-গণনা এ তো এতদিন মানতাম না, এবার বলুন তো মানব কিনা?

জামাইবাবুটি পত্রখানা নিয়ে বললেন, কি বলব বুঝতে পারছি না, কিন্তু তোমাকে শক্ত হতে হবে, অনন্তকে লেখাপড়া শিখতে বাধ্য কর তুমি।

হাসল মীনা। বললে; মাফ করুন জামাইবাবু, এতটা পারব না। তবে আমি পরীক্ষা দেব, আপনাকে সাহায্য করতে হবে।

ঠিক সেই সময়ে অনন্তর ঘরে অনন্ত বসে ছিল। তার ঘরে দেওয়ালে একখানা নতুন ছবি, কালীমূর্তি। ছবিখানিতে টাটকা ফুলের মালা ঝুলছিল।

সামনে পড়ে ছিল একখানা খোলা পত্র।

এমন সময় এলেন তার বাবা, অনন্ত!

উঠে দাঁড়াল সে, বাবা!

দাঁড়াবার সময় পত্রখানা কুড়িয়ে পকেটে পুরলে।

—তোর শ্বশুর চিঠি লিখেছেন, বউমা এবার এগজামিন দেবেন, এখন এখানে আসা চলবে না।

অনন্ত চুপ করে রইল।

বাবা বললেন, তোর মাকে তুই বলেছিস, সেই বেনামী চিঠি তুই লিখিয়েছিলি—বউমাকে দেখে মুগ্ধ হয়ে ?

অনন্ত চুপ করে রইল।

—তুইআমার মুখে কালি দিয়েছিস।

এবার অনন্ত বললে, না। তা আমি দিই নি, আমার ইষ্টদেবীর শপথ করে বলছি।

বলেই সে দেওয়াল থেকে বন্দুকটা পেড়ে হাতে নিয়ে বেরিয়ে গেল।

—অনন্ত !

দূরে গিয়ে সে দাঁড়াল।

—বন্দুক হাতে যাবি কোথায় এই সন্ধ্যের মুখে ?

—নদীর ধারে জঙ্গলটায় কদিন ধরে একটা চিতাবাঘ উপদ্রব করছে, সেটার সন্ধানে যাব।

যেতে যেতে কালীনাথের বাড়ির দরজার সামনে সে একবার থমকে দাঁড়াল।

কালীনাথ কাকে ডাকছিল, রাণী, রাণী, রাণী।

অনন্ত চলে গেল। কাকে ডাকছে বুঝতে বাকী রইল না।

ঘরের মধ্যে কালীনাথ বসে ডাকছিল, রাণী, রাণী।

কারুর সাড়া না পেয়ে 'রাণী' 'রাণী' বলে ডাকতে ডাকতে বেরিয়ে এলো উঠানের বাগানটিতে।

একটি গাছ থেকে রজনীগন্ধা ফুল তুলছিল ব্রজরাণী। কালীনাথ আবার ডাকলে, রাণী।

সবিস্ময়ে ব্রজরাণী মুখ ফেরাল তার দিকে।

কালীনাথ বললে, সাড়া দাও না কেন ?

—আমাকে ডাকছ ? রাণী কে ? আমি কি রাণী ?

কালীনাথ হেসে উঠল। বললে, হা হতোস্মি !

—কেন ?

—সিংহাসনে বসে রাজদণ্ড ধরে বলছ, আমি কি রাণী ?

—সিংহাসন ! রাজদণ্ড ! কোথায় ? ওই রান্নাশালার টুলটা আর হাতাবেড়ি ? ভাল, রাজ্যটার নাম কি শুনি ?

—আমার হৃদয়-রাজ্য সখি ! প্রথম দিন থেকেই সেখানে তুমি রাণী। আজ ঘোষণা করলাম, বুঝলে ? আজ থেকে তুমি ব্রজরাণী নও—শুধু রাণী !

—না-না, সে আমার লজ্জা করবে।

—এত সরল বলেই তুমি এত সুন্দর !

ব্রজরাণী লজ্জিত হ'ল।

—এখন সুখবর শোন, হয়তো কলকাতায় একটা চাকরি পাব।

—তাহলে আমি কোথায় থাকব ?

—আমার সঙ্গে যাবে।

—কলকাতায় ? কলকাতা কিন্তু আমার ভাল লাগে না। এই চাষ-টাষ ছেড়ে কেনই বা যেতে চাও তো বুঝি না আমি !

—না রাণী, এখানটা আমার অসহ্য হয়ে উঠেছে। আমি আর থাকতে পারছি না। তুমি বুঝবে না, অন—। চুপ করে গেল কালীনাথ। তারপর হঠাৎ আবার বললে, তুমি বুঝবে না।

ব্রজরাণী বললে, ঠাকুরপোকে দেখলে কিন্তু আমার ভয় করে আজকাল।

—আঃ, এই বিয়েটা যদি না হ'ত ! ছি-ছি-ছি, ছি ! আঃ !

—মানা চিঠি লিখেছে, বলতে তোমাকে ভুলে গেছি। সে লিখেছে, সে পরীক্ষা দেবে, এখন আসতে পারবে না। আর আমি তাকে লিখেছিলাম যে, ঠাকুরপো সন্ন্যাসীর মত হয়ে গেছে। তাই লিখেছে, সন্ন্যাসী হতে সে পারবে না। চিঠিখানা দেখাই, দাঁড়াও।

—না-না, আমি আর দেখব না। আমি দেখতে চাই নে। ওদের কথা বাদ দাও। আগে আমি অদৃষ্ট মানতাম না, এখন আমি অদৃষ্ট মানি। যার যা অদৃষ্ট, আমিই বা কি করব ? তুমিই বা কি করবে ? অনন্তর অদৃষ্ট !

অনন্ত তখন একটি গাছতলায় বন্দুক হাতে বসে আছে।

সকালবেলা অনন্তর মা বারান্দায় দাঁড়িয়ে আছেন উৎকণ্ঠিতভাবে। সামনে পথ। সেইদিকেই চেয়ে আছেন তিনি। ভোরবেলা মানুষজন বড় নেই। একটি ব্রাহ্মণ স্নানান্তে কমণ্ডলুতে জল নিয়ে চলে গেলেন। একটি গাছের তলায় একটি মেয়ে ফুল কুড়ুচ্ছে। একটি দরিদ্র মেয়ে একটা ঘুঁটের বোঝা মাথায় নিয়ে চলেছে।

পিছন দিকে ঘরের ভিতর থেকে বেরিয়ে এলেন অনন্তর বাবা।

—রাণীবউ !

চমকে উঠলেন মা।

—কাল রাত্রে অনন্ত তাহলে ফেরে নি ?

মা উত্তর দিতে পারলেন না।

বাবা বললেন, আমারই বোঝা উচিত ছিল, তুমি তিনবার উঠে বাইরে গেলে।

এবার মা বললেন, কাউকে পাঠাব দেখতে ?

—না, পাঠাবে না।

—সে তো অন্যায় কিছু করে নি।

—না, খুব অন্যায় করেছে। দিনরাত্রি ব্যাধের মত বন্দুক হাতে ঘুরে বেড়াচ্ছে, চেহারা হয়েছে বাউণ্ডুলের মত।

—তুমি বাপ হয়ে ওর মনের অবস্থাটা ভেবে দেখছ না, বউমা—

—নিজে সে পছন্দ করে জাল চিঠি লিখে প্রতারণা করে আমার মাথা হেঁট করে দিয়ে বিয়ে করেছে। এতে আমি কি করব ?

তিনি উত্তেজনা-ভরেই পিছন ফিরলেন।

সঙ্গে সঙ্গে অনন্তর মাও পিছন ফিরে তাঁর অনুসরণ করে বললেন, না-না, একথা তোমার মুখে সাজে না। তুমি তার বাপ।

ফিরলেন অনন্তর বাবা। ফিরতেই তাঁর দৃষ্টি পড়ল সামনের রাস্তার দিকে, বললেন, ওই, ওই আসছেন তোমার শ্রীমান, ওই !

মা ফিরলেন, দেখলেন—দূরে অনন্ত আসছে। সঙ্গে কতকগুলি লোক। কী একটা বয়ে নিয়ে আসছে।

অনন্তর বাবা বললেন, বোধ করি চিতাবাঘটা মেরেছে। কোন্ দিন অপঘাতেই জীবনটা ওর যাবে।

মা বললেন, তুমি বেয়াইকে চিঠি লেখ, আমিও লিখছি, বউমাকে পরীক্ষা দিতে হবে না, তাকে পাঠিয়ে দিক, না হলে ছেলের বিয়ে দেব।

অনন্তর বাবা পকেট থেকে একখানা পত্র বের করে তাঁর হাতে দিয়ে বললেন, দিও ওকে। ছেলে তোমার সেপাই হতে চলেছে, রাইফেল শুটিং কম্পিটিশনে নাম দিয়েছে। এই নাও।

বলতে বলতে তিনি চলে গেলেন।

অনন্তর মা তাঁর অনুসরণ করলেন, শোন, শোন !

অনন্ত সত্যিই চিতাবাঘ শিকার করেছিল। নদীর ধারে সারা রাত্রি বসে ছিল একটা গাছের উপর। ওখানেই গোচারণ-ভূমি। নদীর ধারে প্রচুর ঘাস, কয়েকখানা গ্রামেরই চাষীদের গরু চরে। কাজেই খানিকটা জঙ্গল। বাঘটা সেইখানেই আশ্রয় নিয়েছিল এবং কয়েকদিনে কয়েকটা গরু-ছাগল মেরেছে। অনন্ত বাঘটাকে মেরে লোকের কাঁধে চাপিয়ে নিয়ে আসবার পথে উঠল কালীনাথের বাড়ি, বাঘ মেরেছি কালীদা, কই তুমি ?

কালীনাথের বাড়ির উঠানে এসে মরা চিতাটা নামিয়েছিল, চিতাটার উপর পা দিয়ে দাঁড়াল সে। কালীনাথ বেরিয়ে এসে সবিস্ময়ে বললে, তাই তো রে, এ যে সত্যিই বাঘ ! কই আমাকে তো কিছু বলিস নি কাল !

হেসে সে বললে, কি বলব ? তুমি তো বলো, জ্যান্ত বাঘ এক চিড়িয়াখানা আর সার্কাস ছাড়া দেখতে নেই। তাছাড়া বউদি একলা, ভেবে সারা হবেন।

কালীনাথ হঠাৎ ঘরের মধ্যে চলে গেল, বলে গেল, আসছি, দাঁড়া।

সে ক্যামেরাটা নিয়ে ফিরে এসে বললে, দাঁড়া, যেমন আছিস।

দূরে ভীত দৃষ্টিতে চেয়ে দাঁড়িয়ে ছিল ব্রজরাণী।

কালীনাথ ছবি তোলা শেষ করলে, আর একটা, দাঁড়া।

আবার একটা তুলে বললে, ব্যাস্।

অনন্ত চিতাটার উপর বন্দুকের বাঁট দিয়ে আঘাত করে বললে, সাক্ষাৎ শয়তান ছিল বেটা। আট-দশটা বাছুর হত্যা করেছে। শুধু বুকটা খেয়ে ফেলে রেখে যেত।

ব্রজরাণী বললে, আহা, এমন করে কুঁদো দিয়ে ঠুকবেন না ঠাকুরপো। নাঃ, আপনি বড় নিষ্ঠুর কিন্তু।

—ওটা মরা, বউদি।

ব্রজ। তাইতেই তো বলছি ঠাকুরপো, মরা যে, তাকে মেরে কি হবে?

কালীনাথ হো হো করে হেসে উঠল, হেসে বললে, রাণী আমার আশ্চর্য।

ব্রজ লজ্জিত হল।

অনন্ত। এটা তাহলে রইল কালীদা। চামড়াটা চেয়েছিলে তুমি।

অনন্ত যখন বাড়ি ফিরল, তার মা তখন ঘরে বসে পত্র লিখছিলেন।

অনন্ত সামনের দরদালান পার হয়ে চলে গেল।

—অনন্ত?

—মা!

—তোর চিঠি।

সে এসে দাঁড়াল। মা চিঠি হাতে দিলেন।

—এসব তুই ছাড়্ বাবা।

অনন্ত রাইফেল ক্লাবের পত্র পেয়ে পড়তে পড়তে বললে, কেন মা?

—পড়াশুনো কর্ তুই। তোকে পড়তে হবে। আমি চিঠি লিখছি বেয়ানকে বউমাকে পাঠিয়ে দিতে। তুইও একখানা বউমাকে চিঠি লেখ্।

অনন্ত শুধু বললে, না মা! চলে গেল সে।

মা চিঠি লিখতে লাগলেন আবার।

অনন্তর বাবা এসে ঢুকলেন ঘরে। স্ত্রীকে বললেন, চিঠি আমি লিখে দিলাম। মেয়ে না পাঠালে, মেয়ে যেন চিরকাল ঘরেই রাখেন তাঁরা। এ বাড়িতে ঢুকতে তিনি আর পাবেন না!

দুখানা চিঠি যথাসময়েই মীনার পিত্রালয়ে পৌঁছল।

মীনার মার হাতে পড়ল অনন্তর মার পত্রখানা। সেখানা তিনি তাঁকেই লিখেছেন। তিনি সে পত্র পড়ছেন এমন সময় মীনার বাবা এসে ঢুকলেন, বললেন, মীনার শ্বশুর চিঠি লিখেছেন বড় বউ।

তাঁর মুখ থমথম করছে।

মীনার মা মুখ তুলে তাঁর দিকে চাইলেন।

মীনার বাবা বললেন, সিধু ঘটককে পেলে আমি চাবুক মেরে পিঠের চামড়া তুলে দিতাম,

জোচ্চোরি করে মেয়েটাকে আমার—। কথাটা শেষ করতে পারলেন না। চলে যেতে উদ্যত হলেন।

হঠাৎ ঘুরে বললেন, মীনাকে আমি জলে ফেলে দিয়েছি, হাত-পা বেঁধে জলে ফেলে দিয়েছি।

মা বললেন, ছি, কি বলছ তুমি?

—ঠিক বলছি। মূর্খতায় আর লোনা জলে কোন তফাৎ নেই, মুখে দেওয়া যায় না।

মা বললেন, তোমরা অবিচার করছ।

—অবিচার করছি?

—হ্যাঁ, লেখাপড়া লেখাপড়া লেখাপড়া! ওটা বাতিক হলে ওর মানে হয় ইংরেজী বুলির অহঙ্কারে দুনিয়াকে ছোট ভাবা। লেখাপড়া শেখে মানুষ মানুষ হতে, অনন্ত তো অমানুষ নয়!

—তাহলে দোষ আমাদের?

—দোষ না হোক, ভুল বোঝা বটে।

—তুমি এ কথা বলবে সে আমি জানি। চিরকালটাই এই করে এলে তুমি।

—হ্যাঁ, আজও করব, তাই বলব। মেয়েকে পাঠিয়ে দাও। ভেবে দেখ, মীনার সামনে সমস্ত জীবন পড়ে আছে।

বেরিয়ে গেলেন তিনি।

এঘর-ওঘর মীনাকে খুঁজে বেড়ালেন তিনি।

ওদিকের দরজা খুলে এসে ঢুকল মীনা।

—তোর শাশুড়ী চিঠি লিখেছেন। তোকে পাঠিয়ে দিতে অনুরোধ করেছেন। লিখেছেন —"বেয়ান, আপনার কাছে মিনতিপূর্ণ অনুরোধ বউমাকে পাঠাইয়া দিবেন। অনন্ত হয়তো আমার পাগল হইয়া যাইবে। অথবা কোন্‌দিন জন্তু-জানোয়ারের হাতে প্রাণ হারাইবে। দিবা-রাত্রি সে পাগলের মতই হিংস্রক জানোয়ারের সন্ধানে ফিরিতেছে।"—তুই শ্বশুরবাড়ি যাবি, তৈরী হয়ে নে। আদেশের সুরে বললেন মা।

—না, আমি যাব না।

—যাবি, তোকে যেতে হবে।

তিনি চলে গেলেন। মীনা দাঁড়িয়ে রইল। মীনার মা সেই কথাই লিখে দিলেন।

অনন্তর মা খুশী হয়ে ছুটে গেলেন স্বামীর কাছে।

অনন্ত তার ঘরে স্তব্ধ হয়ে দাঁড়িয়ে ছিল। কি যেন ভাবছিল। কি হয়ে গেল তার জীবনটা! অথচ তার অপরাধটা কোথায়? অপরাধ কার? হঠাৎ তার কানে এলো মায়ের কথা।

পাশের ঘরে কথা হচ্ছে। বলছেন তার মা। সে কান পেতে সে-কথা শুনতে চেষ্টা করলে।

মা বলছিলেন, এই তো তুমি মিথ্যে রাগ করছিলে, এই দেখ বেয়ান চিঠি লিখেছেন, বউমা আসছেন। বেয়ান লিখেছেন, মেয়ে আমার একটু অভিমানী, আপনি একটু সয়ে নেবেন। দু পক্ষেই ভুল হয়ে গেছে। এ বাড়ির লেখাপড়ার উপর ঝোঁক বেশী। অনন্ত বাবাজীবনের কি এমন বয়স, এখনও যদি লেখাপড়া করে তবে কত সুখের হয়!

অনন্তর বাবা বললেন, ভালই লিখেছেন। খারাপ কিছু লেখেন নি। ও লেখাপড়া শিখলে না, সে কি আমাদের ভাল লাগে!

—তুমি ছেলেকে বল।

অনন্ত আর শুনলে না, বেরিয়ে চলে গেল। বিদ্রোহী হয়ে উঠল তার চিত্ত। না, সে পড়বে না, পড়বে না।

উঠল এসে কালীনাথের বাড়ি।

ব্রজরাণী আর কালীনাথ তখন বেরুবার উদ্যোগ করছে।

ব্রজরাণীর ব্রতচারিণীর বেশ। হাতে থালা। তাতে ডাব পৈতে কড়ি ইত্যাদি।

—অনন্ত থমকে দাঁড়াল, কি ব্যাপার?

কালীনাথ বললে, ব্রত। তুমি যে ব্রাহ্মণ, তোমার বাড়িই তো যাচ্ছিলাম আমরা। তা রাণীর আমার পূজোর জোর আছে, ব্রাহ্মণ নিজেই এসে হাজির।

ব্রজরাণী সলজ্জ হেসে এসে থালাখানি হাতে দিয়ে বললে, দাঁড়ান, প্রণাম করি।

—সে কি? না, আপনার প্রণাম নেব কি?

—না নয়, প্রণাম যে করতে হয়। বলতে বলতেই সে প্রণাম করলে, আশীর্বাদ করুন।

হেসে মুখ তুলে অনন্ত বললে, করেছি।

—না, আমাকে শুনিয়ে বলুন, সিঁথির সিঁদুর নিয়ে নোয়া পরে যেন যেতে পারি।

—না, তা পারব না বউদি। ও তো ঘুরিয়ে বলা, আপনি মরে যান।

—বেশ, তবে বলুন, ওঁর কল্যাণ হোক।

—হ্যাঁ, কালীনাথদা গৌরীনাথ হয়ে উঠুন। আপনি তো কালী নন, আপনি সাক্ষাৎ গৌরী। কালীদার সব কালি ঘুচে যাক—মুছে যাক।

—বাঃ, বেশ বলেছেন। ভারী সুন্দর কথাগুলি। তারপর স্বামীর দিকে তাকিয়ে বললে, দেখ, তুমি দুঃখ কর, ঠাকুরপোর নাম করে বল, সে লেখাপড়া শিখলে না। কেমন কথাটি বললেন, দেখ তো!

অনন্ত বললে, কালীদা, তুমি আমাকে লেখাপড়া শেখাবে? আমি শিখব।

অকস্মাৎ তার চিত্তের সকল বহ্নি যেন শান্তিবারি-বর্ষণে নিভে গেছে, শান্ত হয়ে গেছে। শান্ত আগ্নেয়গিরির মাথার তুষার জমে গলে জলধারা নেমে এলো!

কালীনাথ বললে, আমি এখান থেকে চলে যাচ্ছি ভাই। একটা চাকরি পেয়েছি, কলেজে লেকচারারের চাকরি। গ্রীষ্মের ছুটির পরই কাজে যোগ দেব।

—তুমি পালাচ্ছ কালীদা? তুমি সুখে ঘরকন্না করছ, আর আমি বাউণ্ডুলের মত ঘুরে

বেড়াচ্ছি, তাই? হেসে বললে, আমারও বউ আসছে কালীদা!

ব্রজরাণী উচ্ছ্বসিত হয়ে বলে উঠল, আসছে মীনা? সত্যি?

—সত্যি বউদি! আমি সত্যিই এবার লেখাপড়া শিখব। তারপর বিলেত যাব। মনে মনে ঠিক করে ফেলেছি। বল কালীদা, কি কি বই কিনতে হবে? বই কিনে আনব আমি।

ব্রজরাণী বললে, মীনাকে এবার আমি বকব ঠাকুরপো, আপনি লেখাপড়া জানেন না এই কথা সে বলে কি করে?

বাইরে শোনা গেল গান।

স্টেশন প্ল্যাটফর্মের সেই বাউলটি গান গাইছে গাঁয়ের পথে।

বাউল গান গাইছিল রাস্তার ধারে গাছতলায়।

অনন্ত বেরিয়ে এসে দাঁড়িয়ে খানিক শুনলে:

বহুদিন পরে বঁধুয়া এলে, দেখা তো হ'ত না পরাণ গেলে।

দিন কয়েক পরে মীনা সত্যই এলো। সেদিনও অনন্ত কালীনাথের বাড়ির দরজাতেই দাঁড়িয়ে ছিল। ভেবেছিল স্টেশনে নিজে যাবে মীনাকে আনতে। কিন্তু পথে বেরিয়েও যেতে পারে নি। কে যেন তার পথ আটকেছে। যদি মীনা না আসে! যদি স্টেশনেই কটু কথা বলে? সে পথেই কালীদার বাড়িতে ঢুকে পড়েছিল। কালীনাথদের বলে নি যে মীনা আজ আসছে। হঠাৎ জুড়ির শব্দ পেয়ে সে বেরিয়ে এসেছিল। সুমুখের রাস্তা দিয়ে চলে গেল জুড়ি গাড়িখানা।

ভিতরে দেখা গেল মীনাকে।

সে ফিরল বাড়ির দিকে। পথে কজন ভিখিরী যাচ্ছিল, তাদের সে ডাকলে, পকেট থেকে পয়সা বের করে তাদের দিলে। পথে দেবমন্দিরে প্রণাম করলে।

সে এসে বাড়িতে ঢুকল।

বারান্দায় জিনিসপত্র নামানো রয়েছে।

দাঁড়িয়ে আছে মেয়েরা-ঝিয়েরা। অনন্ত পার হয়ে গেল। মীনার বাপের বাড়ির ঝি তাকে অনুসরণ করলে।

একখানা জনশূন্য ঘর। অনন্ত সেই ঘরে গিয়ে ঢুকল।

ঝিটা পিছনে পিছনে ঢুকে ডাকলে, জামাইবাবু?

অনন্ত থমকে দাঁড়াল, আমাকে বলছ?

—হ্যাঁ। মা, আপনার শাশুড়ী-ঠাকরুন আপনাকে এই চিঠিখানি দিয়েছেন।

অনন্ত হাত বাড়িয়ে পত্রখানা হাতে নিয়ে বেরিয়ে গেল।

এলো আর একটা বারান্দায়।

দ্বিধার মধ্যে খুললে পত্রখানা। পড়লে:—

কল্যাণীয়েষু,

বাবা অনন্ত, আমার আশীর্বাদ লইবে। মীনাকে তোমার হাতে দিয়েছি বাবা, তাহাকে সুখী করিবার ভার তোমার। তোমার উপর ভরসা করিয়া তাহাকে আমি পাঠাইলাম।...

পত্রখানা পড়ে সে হাসলে, পকেটে পুরলে, তারপর দরজা খুলে ঘরে ঢুকল। তার কানের মধ্যে সেই দিনের বাউলের গান মৃদুস্বরে বেজে চলেছে :

বহুদিন পরে বঁধুয়া এলে
দেখা তো হ'ত না, পরাণ গেলে।

ঢুকলো আপনার ঘরে। মীনা ঘরেই রয়েছে। ঘরের মধ্যে মীনা একখানা চেয়ারে বসে টেবিলের উপর মাথা রেখেছে।

অনন্ত থমকে দাঁড়াল।

তারপর আবার হেসেই এগিয়ে গেল। মীনার কাঁধে হাত রাখলে।

মীনা চমকে উঠল, কে ?

—আমি! হাসলে অনন্ত।

মীনা সরে গেল, তিক্ত দৃষ্টিতেই তাকিয়ে বললে, আমাকে কেন তোমরা এভাবে টেনে আনলে বল তো ? তার হাতের ধাক্কায় টেবিলের উপর থেকে সশব্দে একটা ফুলদানি পড়ে গেল, মেঝের ওপর তারই ঝনঝন শব্দে যেন অনন্তর কানের মধ্যেকার সেই গানের সুর কেটে গেল। তবু সে এগিয়ে এসে তার হাত ধরে বললে, আমি যে তোমাকে চাই মীনা। আমি যে তোমাকে ভালবাসি। তোমাকে নইলে আমি ঘরে যে থাকতে পারছি না।

মীনা তার মুখের দিকে তাকিয়ে থেকে বললে, ছাড়ো, হাত ছাড়ো।

অনন্ত বললে, না, শোন।

—কি শুনব ? আমি তোমাকে তো বলেছিলাম, মূর্খতাকে আমি ঘৃণা করি।

অনন্ত তার মুখের দিকে তাকিয়ে রইল, মীনা, আমি লেখাপড়া করব, তোমাকে সুখী করতে চেষ্টা করব।

মীনা হাসলে—তীব্র হাসি,—কোন্ ক্লাসে ভর্তি হবে ?

—মীনা ?

—কেন তোমরা আমাকে এভাবে জোর করে নিয়ে এলে ? কেন ভাবলে না আমি মরে গিয়েছি ?

—সেটা ভাবা যায় না মীনা। এবং আর একটা কথা, তোমাকে আমরা জোর করে আনি নি।

—জোর করে আনো নি ? আমি সেধে এসেছি ? বাবাকে মাকে শাসিয়ে পত্র লেখো নি তোমরা ? পত্র না লিখে তুমি তো বিয়ে করে তারপর জানাতে পারতে, তুমি আবার বিয়ে করেছ ; যে তোমাকে মূর্খ জেনেও ভাবত তুমি স্বামী, তুমি দেবতা, তুমি—। আর বলতে পারলে না সে—ছুটে গিয়ে বিছানায় পড়ে মুখ গুঁজে কাঁদতে লাগল।

অনন্ত চলে যাচ্ছিল, সেও আর সহ্য করতে পারছিল না। কিন্তু চলে যেতে গিয়ে দরজার মুখে থমকে দাঁড়াল, মাথার চুল মুঠোয় চেপে ধরে কিছুক্ষণ ভাবলে, তারপর ফিরে এলো। এবার গতি দ্রুত। তার ধৈর্যের বাঁধ ভাঙছে।

সে কাছে এসে তার পিঠে হাত দিয়ে একটু আকর্ষণ করেই বললে, আমার একটা কথার জবাব দিতে পারো, মীনা?

মীনা মুখ তুললে।

—তুমি এমন কেন?

মীনা তার মূর্তি দেখে থমকে গেল।

অনন্ত ক্ষোভের সঙ্গে বলে গেল, কই, কালীদার বউ তো এমন নয়। কত সুখী তারা। কালীদা গরীব, তবু···

এবার মীনা বলে উঠল, ওই—ওই। তিনি গরীব, তুমি বড়লোক; ওইটেই শিখেছ, বুঝতেও পারছ না তুমি, কার সঙ্গে কার তুলনা করছ! চাঁদে আর বাঁদরে।

অনন্ত অসহ্য ক্ষোভে বলে উঠল, মীনা, কি বলছ? মীনা!

—যা ঠিক তাই বলছি, মিথ্যে করে তাঁর নামে অপবাদ দিয়ে বেনামী চিঠি দিয়ে তুমি আমার জীবনে আগুন ধরিয়ে দিয়েছ।

অনন্ত চিৎকার করে উঠল, না!

মীনা বললে, পশুর মত ব্যবহার করেছ তুমি, চিৎকারও করছ ঠিক তেমনি।

অনন্ত ছুটে বেরিয়ে গেল। বারান্দায় থমকে দাঁড়াল।

কথাটা যেন তাকে তাড়া করেছে, পশুর মত ব্যবহার করেছ তুমি, চিৎকারও করছ ঠিক তেমনি।

আবার ছুটল সে।

সে সিঁড়ি বেয়ে নেমে গেল।

বেরিয়ে সে চলে যাচ্ছিল। কোথায় জানে না, তবে অনেক দূর।

আস্তাবলের ওখানে হঠাৎ থমকে দাঁড়াল, মাথার চুল টানতে লাগল। বন্দুকটার কথা মনে হ'ল—নিরুদ্দেশ যাত্রায় এমন বিশ্বস্ত সহচর আর হয় না, হুকুম করলে মুহূর্তে প্রভুকেই পরপারে পাঠিয়ে দেবে। হুকুম করলেই হল।

ডাকলে, নেত্য?

নেত্য সহিস বেরিয়ে এলো। সে টলছিল, বললে, দাদাবাবু!

—আমার বন্দুকটা আন্ তো। হঠাৎ একটা তীব্র গন্ধ তার নাকে এসে ঢুকল। মদের গন্ধ। বিস্ফারিত দৃষ্টিতে নেত্যর দিকে চেয়ে সে প্রশ্ন করলে, তুই মদ খাচ্ছিলি নেত্য?

—আজ্ঞে···

—কই তোর মদের বোতল? এগিয়ে গেল সে। কই, কই বোতল?

সামনেই পেলে মদের বোতল। বোতলটা তুলে নিলে মুখে। তারপর মাথা এবং বুক

চেপে ধরে বসে গেল।

নেত্য ডাকলে, দাদাবাবু, দাদাবাবু!

দাঁড়িয়ে উঠল অনন্ত। মাথাটা ঝনঝন করছে। উঁহু—হু-হু করছে। আগুনের শিখা জ্বলছে যেন। সেই কাবুলীওয়ালার কথায় যেমন সেদিন রাগ হয়েছিল ঠিক তেমনি। বার দুই মাথা ঝাঁকি দিয়ে পা বাড়ালে সে। চোখে পড়ল জুড়ি গাড়ির চাবুকদানিতে চাবুকটা দুলছে। মাথায় হিংসা উঠল সাপের মত ফণা তুলে। সে নেত্যকে বললে, চাবুকটা নেত্য, চাবুক!

বলতে বলতে নিজেই এগিয়ে গিয়ে টেনে পেড়ে নিলে।

মীনা ঘরে বসে হাঁপাচ্ছিল রাগে। বাপের বাড়ির ঝি তার সামনে দাঁড়িয়ে।

ঝি বলছিল, এ তুমি কি বললে দিদিমণি! না-না-না, মাথা তোমাকে ঠাণ্ডা করতে হবে। না—

মীনা বললে, ঠিক বলেছি আমি। চুপ কর্ তুই।

ঘরের বাইরে অনন্তর কথা শোনা গেল, কি বলছিলে, কই আর একবার বল!

ঘরে ঢুকল সে। হাতে তার চাবুক।

ঝিটা তার আগেই পাশের দরজা দিয়ে পালিয়েছিল।

মীনা কিন্তু চাবুক দেখে ভয় পেলে না, সেও উগ্র হয়েই দাঁড়াল। অনন্ত ঘরে ঢুকতেই বলে উঠল, উঃ, তুমি মদ খেয়েছ! তুমি মদ খাও?

অনন্ত বললে, হ্যাঁ খেয়েছি। বিষ পেলে তাও খাই আজ এই মুহূর্তে। কিন্তু কি বলছিলে আর একবার বল।

চাবুকটা সে সপাং সপাং শব্দে বিছানায় মারতে লাগল।

মীনা বলে উঠল, তুমি মূর্খ, তুমি পশু, তুমি জানোয়ার।

অনন্ত সঙ্গে সঙ্গে চাবুক মারলে, হ্যাঁ, আমি মূর্খ, আমি পশু, আমি জানোয়ার।

তিনবার চাবুক মেরে সে বন্দুক হাতে একটা স্যুটকেশ টেনে নিয়ে হন হন করে বেরিয়ে চলে গেল।

সে বেরিয়ে যাবার পরই ঘর থেকে বেরিয়ে এলো মীনা। সে চলে যাবে—সে চলে যাবে।

পিছনে পিছনে এলেন অনন্তর মা। তিনি বুঝতে পারেন নি কি হয়েছে, ডাকলেন, বউমা, বউমা!

—না-না, কারও সঙ্গে আমার কোন সম্পর্ক নেই। না, আমি চলে যাব। ঝি, ঝি!

চলে গেল মীনা। গ্রামের পথে বের হয়ে স্টেশনে গিয়ে উঠল।

মা ডাকলেন, অনন্ত, অনন্ত, অনন্ত!

এপাশ থেকে এসে দাঁড়িয়ে পথরোধ করে দাঁড়ালেন বাবা, তার মৃত্যুকামনা কর গিন্নী, সে মরে যাক্!

মা বললেন, কি বলছ তুমি? বউমা যে চলে গেলেন, ফেরাও।

—কোন্ মুখে ফেরাব ? ছি ! যান উনি, ওঁকে যেতে দাও। আমি বরং সঙ্গে লোক দিচ্ছি, সরকার, সরকার !

চলে গেলেন অনন্তর বাবা। মা দাঁড়িয়ে রইলেন।

অনন্ত বাড়ি থেকে বেরিয়ে চলে গেল। তার সদর শহরে রাইফেল শুটিংয়ে যাবার কথা ছিল। সে সেখানে গিয়ে উঠল হোটেলে। ব্রজরাণীর দাদা হরদাসবাবু শুটিং গ্রাউণ্ডে তাকে দেখে ধরে নিয়ে গেলেন নিজের বাড়িতে। ক্লান্ত, অবসন্ন, মনে মনে ক্ষত-বিক্ষত অনন্তর নিদ্রা নেই। সেদিন সন্ধ্যায় শহরে হরদাসবাবুর বাড়ির বাইরের ঘরে সে মাথার চুল দুই হাতে খামচে ধরে বসে আছে, ক্লান্ত—বিভ্রান্ত ! বার-দুই আক্ষেপ অনুশোচনায় ঘাড় নাড়লে।

হঠাৎ অস্ফুট-কণ্ঠে বলে উঠল, আঃ, ছি-ছি-ছি ! অধীর হয়ে দাঁড়াল সে।

তার মনের মধ্যে স্মৃতির গ্লানি অহরহ তাকে তাড়না করছিল, মনে পড়ছিল নিজের আচরণের কথা। ছি ছি, সে নিতাইয়ের উচ্ছিষ্ট মদ খেয়েছে ! মদের জ্বালায় বুক জ্বলে গেছে —মাথার ভিতর আগুন জ্বলেছে। তারই জ্বালায় অধীর হয়ে কাণ্ডজ্ঞান হারিয়ে মীনাকে সে চাবুক মেরেছে। বার বার মনে করতে চেষ্টা করেছে সে যে মেরেছে বেশ করেছে। অন্যায় তার নয়। তবু তার মন মানে নি। এক-একসময় ভাবতে ভাবতে সে এইভাবেই হঠাৎ 'ছি ছি' বলে উঠছে। আঃ, কেন সে মাথা ঠাণ্ডা করে মীনাকে বোঝালে না ? অপরাধ তো তার আছে। সে কেন মোপাসাঁ নিয়ে আলোচনা করেছিল ? কেন সে নিজের ইংরিজী-না-জানা স্বরূপের পরিচয় অকপটে প্রথম দিনই ব্যক্ত করে নি ? সব থেকে পীড়া দিচ্ছিল মীনাকে চাবুক মারার স্মৃতি। মীনার গৌরবর্ণ বাহুতে চাবুক কেটে বসে গিয়েছে। রক্ত ফেটে বেরিয়েছে। ছি ছি ছি !

ঠিক এই সময় বাইরে পদশব্দ উঠল। সে চমকে উঠে নিঃশব্দ পদক্ষেপে বিছানায় এসে শুয়ে পড়ল। তার কথা বলবার শক্তি নাই। হু-হু করছে তার অন্তর। ঘুমের ভান করে উপুড় হয়ে পড়ে রইল।

দরজার বাইরে ব্রজরাণীর মা জলখাবারের থালা হাতে দাঁড়িয়ে ডাকলেন, অনন্ত ? সাড়া না পেয়ে পায়ে ঠেলে দরজা খুলে দিলেন, দেখলেন, সে উপুড় হয়ে শুয়ে আছে। ডাকলেন, অনন্ত, অনন্ত !

চটির শব্দ তুলে হরদাসবাবু ঢুকলেন, কই !

মা বললেন, ঘুমিয়ে গেছে।

হরদাসবাবু ডাকলেন, অনন্তবাবু !

মা। ডাকিস নে, বড় ক্লান্ত মনে হচ্ছে।

হরদাসবাবু বললেন, কি জানি, বুঝতে পারলাম না। কিছু যেন হয়েছে ওঁর। যেন কোন অসুখ-টসুখে ভুগছেন। প্রথম তো ওঁকে দেখে আমি চিনতেই পারি নি। কেমন রোগা চেহারা ! যেমন চোখের দৃষ্টি, উস্কখুস্ক চুল, তেমনি জামা-কাপড়, বন্দুক হাতে রাইফেল

শুটিং গ্রাউণ্ডে এসে দাঁড়ালেন—এক হাতে মাথার চুল ধরে, অন্য হাতে বন্দুক।

আমি গিয়ে ডাকলাম, চমকে উঠলেন, বললুম, এ কি, এ কি চেহারা হয়েছে আপনার?

বললেন, শরীরটা আমার ভাল নেই, আমার—

জিজ্ঞাসা করলাম, জ্বর-টর হয়েছে নাকি? এ দেহ নিয়ে এলেন কেন?

বললেন, না, জ্বর নয়। কি জানি—! কি বলবেন যেন ভেবে পেলেন না।

হরদাসবাবু এবং তাঁর মা কথা বলতে বলতে বেরিয়ে এলেন ঘর থেকে। বাইরে থেকে দরজাটা ভেজিয়ে দিলেন। বারান্দার মুখে রাস্তার ধারে দাঁড়িয়ে কথা বলতে লাগলেন তাঁরা।

হরদাসবাবু বললেন, হেসে সপ্রশংসকণ্ঠেই বললেন, নেশার বাতিকে অসুস্থ শরীরেই চলে এসেছেন। হ্যাঁ, তবে বাতিক ওঁর সাজে। অদ্ভুত হাতের এইম, যাকে বলে অবলীলাক্রমে টারগেট হিট করলেন। বেস্টম্যানস্ য়্যাওয়ার্ড নিয়ে বেরিয়ে এলেন। মিনিস্টার খুব খুশী হয়ে আলাপ করলেন। মিনিস্টারকে বললেন, আমাকে মিলিটারী ডিপার্টমেণ্টে ঢুকিয়ে দিন। এই টিমিড লাইফ আমার ভাল লাগে না। কাশ্মীরের লড়াইয়ে পাঠিয়ে দিন। দেবেন? মিনিস্টার হাসতে লাগলেন। ছেলেটি বড় ভাল ছেলে। আমার তো খুব ভাল লাগল। তেমনি মিষ্টি কথাবার্তা। বড় ঘরের ছেলে!

মা বললেন, অথচ এই ছেলে, এই ঘর নিয়ে, সেই চিঠিখানা কে লিখলে বল্ তো—উদ্ধত, গোঁয়ার, নেশাখোর, বাড়িতে এত দেনা—কত কথা!

হরদাসবাবু হেসে উঠলেন হো হো করে।

মা বললেন, তুই হাসছিস কেন? হ্যাসির কি আছে এতে?

হরদাসবাবু হেসে বললেন, তা নেই, কিন্তু ওসব কথা থাক না মা। সে সব তো হয়ে গেছে। ব্রজ তো সুখী হয়েছে। কাজ কি ও চিঠির কথা কয়ে? আবার হাসতে লাগলেন হরদাসবাবু।

মা বললেন, কিন্তু বার বার হাসছিস কেন তুই?

—হাসির কথা বলেই হাসছি। চিঠিখানা তোমার জামাইয়ের লেখা।

—কালীনাথের?

—হ্যাঁ। কালীনাথের পরের চিঠিগুলোর লেখার সঙ্গে মিলিয়ে দেখেছি আমি। খুব চেষ্টা করেছে বাঁ-দিকে বেঁকিয়ে লিখতে, কিন্তু আমাদের চোখ তো উকিলের চোখ! আমি এখানকার হ্যাণ্ডরাইটিং এক্সপার্টকেও দেখিয়েছি। ও কালীনাথের লেখা!

আবারও হাসতে লাগলেন।

মা গালে হাত দিয়ে বললেন, দেখ দেখি কাণ্ড!

—ব্রজকে দেখে খুব ভাল লেগেছে আর কি। এখন আপনা-আপনির ক্ষেত্রে কি ক'রে কি করে? ছেলেমানুষি বুদ্ধি—শেষে ওই বেনামী চিঠি! তা তোমার জামাইয়ের মাথা আছে, প্রেমও আছে, দোষ নেই। নাথিং ইজ আনফেয়ার ইন লাভ য়্যাণ্ড ওআর।

ঘরের মধ্যে অনন্ত মাথা তুলে শুনছিল ; তার চোখ দুটো বিস্ফারিত হয়ে উঠল।

সে উঠে বসল, বার দুই মাথার চুল টানলে।

হরদাসবাবুর ঘরের দেওয়ালে কালীনাথের একখানা ছবি টাঙানো ছিল। কালীনাথের ছবির কাছে এলো সে।

বললে, তুমি সুখী হও কালীদা। তুমি সুখী হও।

ফিরে এসে আবার বসল।

আবার উঠে গেল।

ছবির কাছে গিয়ে বললে, আমিও চেষ্টা করব, লেখাপড়া শিখব আমি, মীনার কাছে ক্ষমা চাইব।

এবার দরজা খুলে বাইরে এলো। বন্দুকটা কাঁধে নিলে।

ডাকলে, হরদাসবাবু?

—অনন্তবাবু! ঘুম ভাঙল?

এসে দাঁড়ালেন হরদাসবাবু।

—আমি এই ট্রেনেই বাড়ি যাব হরদাসবাবু।

—সে কি!

—হ্যাঁ, আমাকে এই ট্রেনেই যেতে হবে। আমাকে মাফ করবেন, এইমাত্র বড় দুঃস্বপ্ন দেখেছি আমি। এই রাত্রেই বাড়ি যাব আমি। আমার মন বড় অস্থির হয়েছে। মাফ করবেন আমাকে। আবার অন্য সময় আসব। মাকে বলবেন, বলবেন ধন্য কন্যা তাঁর, দেবী তিনি, তিনি রাজ রাজেশ্বরীর মত সুখী হয়েছেন।

সে বেরিয়ে পড়ল।

হরদাস ডাকলেন, অনন্তবাবু?

—না, পিছন ডাকবেন না হরদাসবাবু। আমার মন অত্যন্ত চঞ্চল হয়েছে।

বাড়ি এসে ঢুকতেই দেখা হয়ে গেল বাবার সঙ্গে। দেখা হওয়া মাত্র বাবা বললেন, তুই ফুলাঙ্গার, তোর মত সন্তান থাকার চেয়ে নিঃসন্তান থাকাও সংসারে সৌভাগ্য। তুই আমার মাথা হেঁট করে দিলি। বউ ঘরের লক্ষ্মী, তাকে তুই চাবুক মেরে তাড়িয়ে দিলি? ছি, ছি, ছি!

চলে গেলেন তিনি।

অনন্ত স্তব্ধভাবে দাঁড়িয়ে রইল।

মা এসে দাঁড়ালেন, অনন্ত?

—মা?

মা তার মুখের দিকে তাকালেন। তিনিও ভেবেছিলেন, তাকে তিনি তিরস্কার করবেন, কঠিন তিরস্কার করবেন, কিন্তু তার মুখ দেখে তা তিনি পারলেন না, শুধু বললেন, এ তুই কি করলি অনন্ত!

—এর প্রায়শ্চিত্ত আমি করব মা! আমি শ্রীরামপুরে যাচ্ছি।

—অনন্ত! শঙ্কা ফুটে উঠল মায়ের কণ্ঠে।

—কিছু ভেবো না মা। মীনার কাছে অপরাধ স্বীকার করব। ক্ষমা চাইব। শ্বশুরমশায়ের পায়ে ধরব। আর আমি লেখাপড়া করব, আমি বিলেত যাব। বলে আসব তাঁদের। তুমি ভেবো না। অপরাধ আমি করেছি, তার প্রায়শ্চিত্ত আমাকে করতেই হবে।

মায়ের পায়ে প্রণাম করলে। উঠে দাঁড়িয়ে বললে, কাল দুপুরের ট্রেনে আমি নিশ্চয় মীনাকে নিয়ে ফিরব মা। এই ট্রেনেই আমি যাব।

অনন্ত মীনার পিত্রালয়ে পৌঁছল। বাড়ি ঢুকতেই দেখা হল শ্বশুরের সঙ্গে। বারান্দায় দাঁড়িয়ে ছিলেন শ্বশুর।

সে এসেই নতজানু হয়ে বসে শ্বশুরের পায়ে ধরে বললে, আমাকে মাফ করুন, আমাকে ক্ষমা করুন। আমি···

পৃথ্বীশবাবু চিৎকার করে উঠলেন, না-না-না, তুমি···তুমি···

রাগে তাঁর কথা বন্ধ হয়ে গেল।

সে ধীরভাবে বললে, আমি অপরাধী, আমি অপরাধ স্বীকার করছি।

পৃথ্বীশবাবু পা টেনে নিয়ে আবার চিৎকার করে বললেন, মূর্খ, প্রতারক তুমি···তুমি···

—কোন কথার প্রতিবাদ করব না আমি। যে অপরাধ বলবেন, তাই করেছি আমি। আমাকে এইবারের মত ক্ষমা করুন। মীনাকে···

সে কথা শেষ করতে পারলে না।

পৃথ্বীশবাবু এবার উন্মাদের মত চিৎকার করে বললেন, মীনাকে তুমি চাবুক মেরেছ! মাতাল, মূর্খ, তোমাকে আমি···

কথা শেষ না করেই দ্রুত ঘরে চলে গেলেন।

সে অনুসরণ করতে গিয়ে থমকে দাঁড়াল। দীর্ঘনিশ্বাস ফেললে।

ক্ষমা নাই? তবে? একবার মনে হল ফিরে যায়। হ্যাঁ, সেই ভাল। ঘুরে দাঁড়াল সে। কিন্তু কয়েক পা এসে আবার থমকে দাঁড়াল, না, পালিয়ে গেলে হবে না, প্রায়শ্চিত্ত তাকে করতেই হবে।

এরই মধ্যে ঘর থেকে পৃথ্বীশবাবু বেরিয়ে এলেন চাবুক হাতে এবং পিছন ফিরে দাঁড়ানো অনন্তর পিঠে সজোরে মারলেন সেই চাবুক।

—এই তার শোধ!

সে তীব্র যন্ত্রণায় অধীর হয়ে ঘুরে দাঁড়াল। অকস্মাৎ আগুনের দড়ির মত কি একটা তার পিঠটাকে পুড়িয়ে দিলে। কি? ও চাবুক! মুহূর্তে চাবুকটা চেপে ধরলে।

পৃথ্বীশবাবু। ছাড়ো চাবুক!

সে ছেড়ে দিলে। বললে, মারুন আপনি। তাই হোক।

সে স্থির হয়ে দাঁড়াল। মীনাকেও এমনি লেগেছিল।

পৃথ্বীশবাবু চাবুক মারতে লাগলেন, এই তার শোধ। এই, এই, এই—

তারপর চাবুকটা ছুঁড়ে ফেলে দিয়ে বললেন, তোমাকে ক্ষমা করব, যদি তুমি মরতে পার!

অনন্ত তাঁর দিকে একবার ফিরে তাকিয়ে হন হন করে চলে গেল ফটকের দিকে।

পৃথ্বীশবাবু পিছন থেকে ডেকে বললেন, তোমার যে বন্দুক দিয়ে জানোয়ার মারো, সেই বন্দুকের গুলিতে নিজের জানোয়ারের জীবনটাকে শেষ করো, ক্ষমা করব তোমাকে।

মীনা উপরের জানালার গরাদটা শক্ত মুঠোয় ধরে দাঁড়িয়ে ছিল।

সেখান থেকে দেখা যাচ্ছিল ফটক। দেখলে সে, অনন্ত চলে গেল। দাঁড়িয়ে রইল মীনা। সমস্ত যেন কেমন গোলমাল হয়ে যাচ্ছে। কি হল? অদূরে স্টেশনটাও দেখা যায়। ওই ট্রেন ছাড়ল। ট্রেনের ধোঁয়া দেখা যাচ্ছে। ধোঁয়ায় সব যেন ঢেকে গেল।

মীনার মা এসে ঘরে ঢুকলেন, মীনা!

মীনা পাথর হয়ে গেছে। কি হ'ল? এও তো সে চায় নি!

ট্রেনের হুইসিলের শব্দ উঠল।

মীনার মা ছুটে বেরিয়ে গেলেন, ওরে, ছি ছি, ছি ছি ছি!

গ্রামের স্টেশন।

স্টেশনের বাইরে পালকি এবং কর্মচারী এসেছে। অনন্ত তার বউ নিয়ে নামবে।

স্টেশনে ট্রেন এসেছে। ফটক থেকে লোকজন বের হচ্ছে। চারিদিকে হৈ-চৈ। ফেরিওয়ালা হাঁকছে। তারই মধ্যে একতারা বাজিয়ে সেই বাউলটা গাইছিল।

দুখের কথা বলিসনেকো কারও কাছে,—নাই বলিতে।
সুখের মেলায় দুখের ঠাঁই সে বার-কানাচে; হায় বলিতে।
(ও) হায় বলিসনেকো।

ভিড়ের সঙ্গে অনন্ত বেরিয়ে এলো।

মাথায় চাদর দিয়ে নিজের মাথা-মুখ ঢেকে রেখেছিল সে।

কর্মচারী তাতেও চিনতে পারলে এবং সবিস্ময়ে সজোরেই ডেকে উঠল, দাদাবাবু?

সে দাঁড়াল না। এগিয়ে গেল। কর্মচারীও অনুসরণ করে এগিয়ে গেল, দাদাবাবু, বউদি?

—আসে নি।

বলেই সে হন হন করে চলল—চলল সে মাঠের পথে, গ্রামের বাইরে বাইরে। মুখে কপালের উপরে চাবুকের দাগ। অস্নাত—বিভ্রান্ত। তারও চেয়ে শোচনীয় তার অন্তরের

অবস্থা! ক্ষত-বিক্ষত হয়ে গেছে ভিতরটা।

খিড়কির দরজা দিয়ে ঢুকল।

ছুটে সোজা নিজের ঘরে এসে ঢুকল।

টেবিলের উপর ভর দিয়ে দাঁড়াল।

সামনে বড় আয়না।

ধীরে ধীরে চাদরখানা খুললে। কপালে নাকে গালে লম্বা হয়ে বসেছে চাবুকের দাগ, জামা ছেঁড়া, অবিন্যস্ত রুক্ষ চুল। সে চোখ বুজলে।

কানের কাছে শব্দ ধ্বনিত হয়ে উঠল, ক্ষমা করব যদি মরতে পার। পৃথ্বীশবাবুর কথা কানের কাছে এখনও বাজছে।

সে ফিরে তাকালে বন্দুকের র‍্যাকের দিকে।

ধীরে ধীরে এসে দাঁড়াল সেখানে।—ধরলে বন্দুকটা।

কানের পাশে বেজে চলেছে শ্বশুরের কথা, তোমায় ক্ষমা করব, যে বন্দুক দিয়ে তুমি জানোয়ার মার, সেই বন্দুক দিয়ে···

তুলে নিলে বন্দুকটা। খুলে দেখলে টোটা আছে কিনা।

বন্দুকটি উইনচেস্টার রিপীটার। একসঙ্গে ছটি কার্টিজ থাকতে পারে।

দেখলে কার্টিজ আছে।

বন্ধ করে বন্দুকটার বাঁট মাটিতে রেখে নলটার উপরে নিজের থুতনি রাখলে। তারপরে একটা পা ট্রিগারের উপর তুলে দিলে।

যাক্, শেষ হয়ে যাক্ তার জীবন।

কানের পাশে বাজছিল, জানোয়ারের জীবনটাকে শেষ করো।

থমকে গেল অনন্ত। নামিয়ে নিলে পা ট্রিগার থেকে।

চোখে তার উন্মত্তের দৃষ্টি তখন।

বলে উঠল, জানোয়ার, আমি একা? তুমি? এমনি করে তুমি আমাকে ক্ষত-বিক্ষত করলে? ছুটে গেল আয়নার সম্মুখে টেবিলের ধারে। নিজের ক্ষত-বিক্ষত মূর্তি দেখলে। দেখতে দেখতে হঠাৎ চোখে পড়ল টেবিলের উপর একখানা চিঠি।

কালীনাথের লেখা।

"অনু, আজ তোর বউদিদির ব্রত উদ্‌যাপনের দিন। তুই না বলে শ্বশুরবাড়ি চলে গেছিস, কি বিপদ বল্ তো! ভগবান রক্ষে করেছেন যে তুই ফিরে আসছিস। এসেই যেন এ-বাড়ি আসিস। তোর বউদি না খেয়ে বসে থাকবে।"

অনন্তর চোখ জলে উঠল; বললে, জানোয়ার! হ্যাঁ, ওই এক জানোয়ার।

সঙ্গে সঙ্গে সে বেরিয়ে পড়ল। খিড়কির দরজা দিয়ে বেরিয়ে এলো।

গ্রীষ্মকালের দ্বিপ্রহর। আকাশে সূর্য অগ্নিবর্ষী। অনন্তর মাথায় আগুন জ্বলছে!

সম্মুখের জনহীন পথ অতিক্রম করে চলল সে।

কালীনাথের বাড়ির সম্মুখে তখন জানালায় দাঁড়িয়ে আছে ব্রজরাণী। সে ব্রত করে রয়েছে। উৎকণ্ঠিত তার দৃষ্টি।

ঘরের ভিতরে ইজিচেয়ারে বসে কালীনাথ বই পড়ছে।

ব্রজরাণী এসে বললে, ঠাকুরপো আসছেন বোধ হয়।

কালীনাথ উঠল, আসছে?

বাইরে ডাক শোনা গেল ভাঙা গলায়, কালীদা!

—অনু!

বেরিয়ে গেল কালীনাথ। ব্রজরাণী চলে গেল ভিতরে।

কালীনাথ দরজা খুললে।

সামনে অনন্ত। ক্ষত-বিক্ষত দেহ। পিছনে পিঠে বন্দুকটা ঝুলছে।

কালীনাথ শিউরে উঠল, বললে, এ কি অনু? এ কি চেহারা তোর? অনু!

—জানোয়ার, জানোয়ারে ক্ষত-বিক্ষত করে দিয়েছে।

—কোথায়? বুঝতে পারলে না কিছু কালীনাথ। সবিস্ময়ে বললে, তাই বুঝি বন্দুক নিয়ে···

—হ্যাঁ, মারতে বেরিয়েছি। শোধ নেব কালীদা।

—অনু কি বলছিস? অনু?

—আর একটা জানোয়ার, আমার ভিতরটা—গোটা জীবনটা এর চেয়েও ক্ষত-বিক্ষত করে দিয়েছে। এরপর তাকে মারব! তারপর নিজেকে। তার আগে···

এবার তার চোখের দিকে তাকিয়ে শিউরে উঠল কালীনাথ। অনন্ত তার দিকেই তাকিয়ে আছে। তার দৃষ্টি যেন কি বলছে, কিছু ভয়ঙ্কর কঠিন। সভয়ে বললে, ওরে অনু, অনু!

সভয়ে পিছিয়ে গেল কালীনাথ। ঘরে ঢুকল। সে বুঝেছে, বুঝতে পেরেছে।

অনুসরণ করে অনন্ত ঘরে এসে ঢুকে বন্দুক তুলে ধরে বললে, এই ঘরে তুমি একটা কুকুর মেরেছিলে মনে পড়ছে? তার দোষ সে তোমার বিছানায় শুয়েছিল। মনে পড়ে? আর তুমি আমার জীবনটাকে···

—অনু ক্ষমা···অনু ক্ষমা! আর্তস্বরে চিৎকার করে উঠল কালীনাথ। হাত জোড় করলে।

—না-না, জানোয়ার আমি রাখব না কালীদা—

বন্দুক তুলতেই কালীনাথ বন্দুকের নলের মুখ চেপে ধরলে। অনন্ত সেই অবস্থাতেই ফায়ার করলে। সে উন্মত্ত! ক্ষমা নেই—নেই!

কালীনাথের হাতটা ভেঙে গেল।

অনন্ত রিপীটার ভেঙে কার্টিজটা বের করে আবার বন্দুক তৈরী করতে করতে কালীনাথ আহত হাত নিয়েই ভিতরের দিকে ছুটল।

ওদিক থেকে অজানিত আশঙ্কায় ব্রজরাণী চিৎকার করে উঠল, ঠাকুরপো! তার কানে গেছে কালীনাথের আর্ত কণ্ঠস্বর, অনু ক্ষমা—ক্ষমা!

অনন্ত আবার বন্দুক তুললে।

ব্রজরাণী ছুটে এসে তার সেই রুদ্রমূর্তি দেখে চিৎকার করে উঠল, না-না-না। মুহূর্তে আছাড় খেয়ে সে পড়ে গেল। মূর্ছিত হয়ে গেছে সে। অনন্ত সঙ্গে সঙ্গে গুলি ছুঁড়লে। এবার কালীনাথ পড়ে গেল।

অনন্ত বাইরের দরজায় এসে থমকে দাঁড়াল।

পিছন ফিরে তাকিয়ে দেখলে।

মূর্ছিতা ব্রজরাণীকে দেখা যাচ্ছিল—ভিতরের বারান্দায় পড়ে রয়েছে।

সে অকস্মাৎ একটা পশুর মত দুর্বোধ্য বিচিত্র চিৎকার করে উঠল, আঃ!

তার পরই বন্দুক মুখে লাগিয়ে পা দিয়ে ট্রিগার টিপল।

শব্দ উঠল, ক্লিক! আওয়াজ হল না। প্রচণ্ড একটা আঘাত এলো না।

কি হল? সঙ্গে সঙ্গে বন্দুকটা খুলে ভেঙে দেখলে, চেম্বার শূন্য!

চিৎকার করে অনন্ত বলে উঠল, নেই, কার্টিজ নেই? হেসে উঠল হা-হা করে! কেন তা সে নিজেও জানে না। কালীনাথ মরেছে বলে? অথবা গুলি নেই বলে? হায় রে তার কপাল বলে? কে জানে?

পরমুহূর্তে স্তব্ধ হয়ে গেল। আতঙ্কে বিস্ফারিত হয়ে উঠল তার চোখ। মুখ কেমন হয়ে গেল। ভয়ার্তের মত সে ছুঁড়ে ফেলে দিলে বন্দুকটা, ফেলে দিয়েই ছুটল।

প্রান্তরের মধ্যে দিয়ে সে ছুটতে লাগল। পিছনে কি রক্তাক্ত দেহ কালীনাথ তাড়া করে আসছে, না কেউ ফাঁসির দড়ি হাতে ছুটছে তার পিছনে?

তখন ঝড় উঠেছে অপরাহ্ণের। প্রান্তরের বুকে ধুলোর ঝড়ের মধ্যে সে ঢাকা পড়ে গেল।

চার বছর পর।

চারটে বছর কেটে গেছে। যেন সেই ধূলোর ঝড়ে উড়িয়ে নিয়ে গেছে চারটে বছর।

ব্রজরাণীর পিত্রালয়ে ব্রজরাণী বসে ছিল।

মাথায় তৈলহীন রুক্ষ চুল। পরনে থান কাপড়। চোখে বিচিত্র দৃষ্টি। স্থির শূন্য। তার সামনে থেকে ঘরের দেওয়ালটাও যেন মিলিয়ে গেল।

সেখানে সে দেখতে পাচ্ছে অনন্তর সেই রুদ্র মূর্তি, পেশীসবল দেহ, বিপর্যস্ত রুক্ষ চুল, চোখে উদ্‌ভ্রান্ত দৃষ্টি।

আর তার পায়ের কাছে পড়ে আছে কালীনাথের শবদেহ। মুখখানা শুধু দেখা যাচ্ছে।

আতঙ্কে শিউরে উঠে সে আঙুল দেখিয়ে 'উঃ' বলে আর্তনাদ করে উঠল।

বাইরে থেকে ছুটে এলেন তার মা।

—ব্রজ, ব্রজ!

ব্রজরাণীর সম্মুখে তখন সে দৃশ্য মিলিয়ে গেছে। ফুটে উঠেছে ঘরখানির সাধারণ প্রত্যক্ষ দৃশ্য।

মা আবার ডাকলেন, ব্রজ ?

ব্রজ বার দুই চোখ বন্ধ করে আত্মস্থ হয়ে ক্লান্ত স্বরে সাড়া দিলে, মা !

—ভয় পেয়েছিস বুঝি ?

দীর্ঘনিশ্বাস ফেলে ব্রজ বললে, হ্যাঁ মা, হঠাৎ মনে হল···

চুপ করে গেল সে।

মা কাছে বসলেন, বললেন, কতবার তোকে বলি ব্রজ, তুই অন্য কিছুতে একটু মন দে, ভগবানকে পূজো কর্—একটু আধটু বই-টই পড়্।

—না !

—কিন্তু অহরহ সেই এক স্মৃতি নিয়ে ধ্যান করলে তুই যে পাগল হয়ে যাবি !

—হবো না মা, আজ চার বছরে তো পাগল হই নি, আর কটা দিনে পাগল হবো না।

—চার বছর তোর চোখে ঘুম নেই !

—চোখ বুজলেই সেই অসুর মূর্তি আমার সামনে দাঁড়ায়। সে অসুর মা, সে অসুর !···ওঃ মা, সে হাত জোড় করে বলেছিল, অনু ক্ষমা, অনু ক্ষমা ! কিন্তু উন্মত্ত দৈত্যের মত···

ফুঁপিয়ে কেঁদে উঠল ব্রজরাণী, কাপড় দিয়ে মুখ ঢাকলে।

দেখতে পেলে সেই ছবি—অনন্ত গুলি করছে কালীনাথকে।

সঙ্গে সঙ্গে মুখের কাপড় খুলে ফেলে তীক্ষ্ণ আক্রোশ-ভরা কণ্ঠে বলে উঠল, আমি তাকে ক্ষমা করব না মা, না-না-না ! তুমি ওঁদের বলে দাও, বলে দাও ওঁদের। বলতে বলতে উঠে চলে গেল।

মা ডাকলেন, ব্রজ ?

এপাশ থেকে সেই মুহূর্তেই ডাকলেন হরদাস, মা ?

মা থমকে দাঁড়ালেন। মুখ ফেরালেন।

হরদাস ঘরে ঢুকে বললেন, ইনি যে একবার···

—ওঁদের তুমি ফিরিয়ে দাও হরদাস, ব্রজরাণী ক্ষমা করতে পারবে না। সে হয় না।

—বলেছি মা, বার বার বলেছি, কিন্তু অনন্তর বাবা হাত জোড় করে বলছেন, তিনি একবার শুধু দেখা করতে চান।

—দেখা করতে ? কার সঙ্গে ? ব্রজর সঙ্গে ?

—হ্যাঁ।

—হরদাস !

—মা, এ আমি তাঁর কাছে প্রতিজ্ঞাবদ্ধ। তাঁর কথাগুলি ব্রজকে বলব বলে আমি প্রতিশ্রুতি দিয়েছি। কথাগুলি তুমি শোন। কিন্তু দোহাই, আমার কোন অভিসন্ধি আছে ভেবো না।

—তার আগে আমার কয়েকটা কথার জবাব দাও হরদাস।

হরদাস তাঁর মুখের দিকে তাকালেন।

মা বললেন, তুমি কি তাঁদের বলেছ যে, স্বামী-হন্তার শাস্তির দিন গুনে গুনে ব্রজরাণী আজ চার বছর মাথায় তেল দেয় নি, চোখে তার ঘুম নেই, চার বছর সে ঘুমোয় নি, মাটি ছাড়া বিছানায় সে শোয় নি ?

—বলেছি মা, সব বলেছি।

—তবু তিনি দেখা করতে চান ?

—লোকটিকে তোমরা ভুল বুঝছ মা। চার বছর আগে, যখন খুনের সাতদিন পর পুলিস অনন্তকে ধরে নিয়ে এলো, তখন সে উন্মাদ পাগল। কোর্ট তার অবস্থা দেখে ডাক্তারের রিপোর্ট নিয়ে রাঁচি পাঠালে চিকিৎসার জন্যে। আমার মনে আছে মা, তার বাবা তার গায়ে হাত বুলিয়ে বলেছিলেন, আমি আশীর্বাদ করি তুমি সেরে ওঠো—এসে তোমার দণ্ড নিয়ে মহাপাপ থেকে মুক্ত হও। তখন কালীনাথের মৃত্যুর আক্রোশ আমার মনেও দগ্‌দগ্‌ করছিল, আমিও সেদিন তাঁকে ভুল বুঝেছিলাম, কিন্তু আজ···

ঘাড় নেড়ে 'না'-এর ভঙ্গিতে হরদাসবাবু জানালেন, না, আজ তাঁকে বুঝতে ভুল হয় নি। এ মানুষকে তিনি বুঝেছেন। তিনি সন্তানকে বাঁচাবার জন্যে আসেন নি, এসেছেন ক্ষমা চাইতে। এখানকার বিচারের চেয়েও বড় বিচারের জন্য তাঁর প্রয়োজন আছে, আর প্রয়োজন আছে···

মা বললেন, বুঝলাম হরদাস তিনি ভাল লোক, কিন্তু ব্রজর কাছে তিনি চান কি ? ক্ষমা তো ?

—হ্যাঁ, কিন্তু সে ছেলের জন্যে নয় ; চান বংশের জন্যে। বললেন, তাঁর বাপ, অনন্তর পিতামহ আর কালীনাথের মাতামহ একই ব্যক্তি—তাঁর জন্য, আর ব্রজর ছেলে যখন হয়েছে, তখন তার ভবিষ্যতের জন্য, তিনি কিছু সম্পত্তি দিতে চান।

—ঘুষ ?

—না মা, ও-কথা বলো না। তাঁর সঙ্গে দেখা করলে ও-কথা বলতে পারবে না। তিনি বললেন, হরদাস, অনন্ত যদি কালীনাথকে হত্যা না করে আত্মহত্যা করত, তবে আমার সম্পত্তির উত্তরাধিকারী হত কালীনাথ। কালীনাথ নেই, তার ছেলেকে যে সম্পত্তি দিতে চাচ্ছি তাতে তার অধিকার আছে। আর একজনের কথা বলি মা, তাহলেই কথাটা পরিষ্কার হবে। অনন্তর শ্বশুরও এসেছেন। তিনি আগেও এসেছিলেন—চার বছর আগে সে যখন প্রথম ধরা পড়ে, এসে বলেছিলেন, আমি পঁচিশ হাজার টাকা দেব কালীনাথের ছেলের জন্যে। আমি ঘেন্নার সঙ্গে বলেছিলাম, না !

—তিনিই তো জামাইয়ের জন্যে এখন লড়ছেন ?

—হ্যাঁ, কলকাতা থেকে ব্যারিস্টার আনিয়েছেন।

—এখন আপসোস হয়েছে ! হাসলেন, তারপর বললেন, তুমি ওঁদের যেতে বলে দাও হরদাস। ব্রজকে এ অনুরোধ করতে আমি পারব না।

পাশের ঘরেই ব্রজরাণী তখন বসে নীরবে আপন মনে ঘাড় নাড়ছিল ধীরে ধীরে দৃঢ়ভঙ্গিতে,

না-না-না। চোখের দৃষ্টিতে তার বিচিত্র একাগ্রতা অথবা শূন্যতা।

পাশে বসে ছিল তার ভ্রাতৃবধূ। সে বুঝতে না পেরে বললে, ঠাকুরঝি!

ব্রজ তার দিকে তাকালে।

—এমন করে ঘাড় নাড়ছ কেন?

ম্লান হাসলে ব্রজ। বললে, বলছি, না-না-না, ক্ষমা করতে আমি পারব না। দাদার কথা শুনতে পাচ্ছ না? একটু চুপ করে থেকে আবার বললে, আর ভাবছি, মনের সঙ্গে কথা বলছি, আদালতে সাক্ষী দিতে হবে, জেরা করবে তো, তাই সব ঠিক করে নিচ্ছি। যদি বলে চার বছর আগের ঘটনা, আপনার ভুল হচ্ছে, অনেক কথা মনে নেই আপনার। আমি বলব, না-না-না। কথা বলার সঙ্গে তার সর্বাঙ্গ দুলে উঠল, সেও যেন বলে উঠল, না-না-না। ব্রজরাণী বলে গেল, ভুলি নি, ভুলবার নয়। আমি ভিতরে ভাঁড়ারঘরের দাওয়ায় বসে, ওই অসুরকে ব্রাহ্মণ বলে তার খাওয়ার উদ্যোগ করছিলাম। আর···

চোখ দিয়ে জল গড়াল। হাসলে। একটু চুপ করে রইল।

হাসিটি ফুটেই রইল। হাসি নিয়েই বললে, বউদিদি, গুন গুন করে মনের আনন্দে গান গাইছিলাম। আমার কত সুখ—কত সুখের ঘর। গাইছিলাম—

সুন্দর মম গৃহে আজি পরমোৎসব রাতি।

এ গানটা শিখেছিলাম ওরই বউ মীনার কাছে। আমাদের ফুলশয্যার রাত্রে ওই গান সে গেয়েছিল। তার কথায় বাধা পড়ল—ঢং শব্দ করে ঘড়িতে একটা বাজল।

কথা বলতে বলতে চমকে উঠল ব্রজরাণী, বলে উঠল, বউদি! ও কি বউদি? বন্দুকের শব্দ?

বউদি বললে, ও একটা বাজল ভাই!

ব্রজ চুপ করে বসে রইল।

হঠাৎ আবার বললে, কাল থেকে তো দায়রা শুরু?

চার বছর কেটে গেছে। ঝড়ের ধুলোর মধ্যে কটি জীবন যেন কুটোর মত পাক খেয়েছে।

অনন্ত ছুটে পালিয়েছিল। সে কি ছোটা! পৃথিবীর এক প্রান্তে যেন ছুটে পালাতে চেয়েছিল। উন্মাদ হয়ে গিয়েছিল। নইলে সে যে মানুষ তাতে সে সহজেই আত্মহত্যা করতে পারত। রেলের তলায় ঝাঁপিয়ে পড়তে পারত। জলে ডুবতে পারত। গাছের ডালে ফাঁস লাগিয়ে ঝুলতে তার ভয় হবার কথা নয়। পাহাড় থেকে ঝাঁপ খেতেও সে পারত। কিন্তু তা পারে নি। তার মনে হয়েছিল, গুলিতে দুই হাত ভাঙা কালীনাথ দুই ভাঙা হাত বাড়িয়ে তাকে ধরবার জন্য পিছনে পিছনে ছুটে আসছে, তাকে ধরে নিতে আসছে, কালীনাথের সঙ্গে ছুটে আসছে ব্রজরাণী। কিছুতেই সে দাঁড়াতে পারে নি। ছুটেছিল, ছুটেছিল—হেঁটে, ট্রেনে, কি করে, কেমন করে, কোন্ পথে—তা নিজেও সে বলতে পারে না। জানে না। সাতদিন

পর ধরা পড়েছিল বাংলা দেশ পার হয়ে—আসামের পার্বত্য প্রদেশে। পুলিস তার রক্তাক্ত চোখ, ভীতার্ত চাহনি, ছিন্নভিন্ন পরিচ্ছদ, ছুটন্ত গতি দেখে তাকে ধরেছিল। ভেবেছিল পুলিস দেখেই ছুটে পালাচ্ছে! পুলিস তাকে অনুসরণ করে ধরতেই সে হা-হা করে হেসে উঠেছিল।

—হা-হা-হা! হা-হা-হা! হা-হা-হা! সে নিরাপদ, আর কি করবে কালীনাথ? নিশ্চিন্ত নিরাপদ। হা-হা-হা!

তার পকেটে পত্র ছিল। মীনার পত্র। সেই পত্র দেখে তাকে পাঠিয়েছিল তার জেলায়। মীনার ঠিকানায় একটা খবরও পাঠিয়েছিল।

মীনা পত্রখানা পেয়ে থর থর করে কেঁপে উঠেছিল। কালীনাথের হত্যার সংবাদ তার অনেক আগেই পৌঁছে গেছে। কালীনাথের হত্যার দ্বিতীয় দিন সন্ধ্যায় পুলিস এসেছিল তাদের বাড়ি।—অনন্তবাবু আসেন নি? আপনার জামাই?

—না তো! কেন? পুলিস দেখে চমকে উঠেছিলেন পৃথ্বীশবাবু।

স্থানীয় পুলিস কর্মচারী সংবাদটা গোপন করেন নি। আপনার জামাই তার পিসতুতো ভাইকে গুলি করে হত্যা করেছেন।

—গুলি করে খুন করেছে?

—হ্যাঁ, পরশু দুটোর সময়। তার পর থেকে নিরুদ্দেশ!

পৃথ্বীশবাবু পাথর হয়ে গিয়েছিলেন। তিনি হিসেব করেছিলেন, পরশু সকালে সে এখানে এসেছিল, তিনি চাবুক মেরেছিলেন, সে চলে গিয়েছিল। তখন বেলা আটটা। এখান থেকে সওয়া-আটটার ট্রেনে রওনা হলে মীনার শ্বশুরবাড়ি পৌঁছানো যায় বেলা দেড়টা-দুটোর সময়।

আরও একজন পাথর হয়ে গিয়েছিল—সে মীনা। সে ছিল পাশেই—লাইব্রেরী ঘরে। সে তাকিয়ে ছিল সেই বাগানের দিকের জানালাটার দিকে, যে জানালাটায় উঠে অনন্ত বন্দুক হাতে ঘরের মধ্যে এসে লাফিয়ে পড়েছিল—সাপটাকে মেরেছিল; তাকে প্রথম দেখার ছবিটা তার মনে পড়ে গেল।

তারপর এই চার বছর সেও যেন এই ধুলোর ঝড়ে পাক খেয়েছে।

এই চার বছরে আরও একটা কথা সে জানতে পেরেছে। তার বাবা জেনেছেন। সেই বেনামী পত্রখানার কথা। বেনামী পত্রখানা কালীনাথের হাতের লেখা। পুলিসই বের করেছে। কালীনাথের বাড়িতে তদন্ত করতে গিয়ে পেয়েছিল পত্রখানা। প্রথম তারা কালীনাথের বিরুদ্ধে লেখা পত্রখানা অনন্তর লেখা মনে করে তার বিরুদ্ধে প্রমাণ হিসাবে সংগ্রহ করেছিল। কিন্তু হাতের লেখা পরীক্ষায় জানা গেছে, ওখানা তার লেখা নয়—কালীনাথের লেখা!

সব গোলমাল হয়ে গেছে। তবে তো সে দায়ী নয়!

পৃথ্বীশবাবু দীর্ঘনিশ্বাস ফেলে বলেছিলেন, এ কি মারাত্মক ভুল করলাম আমি!

তিনি দীর্ঘক্ষণ পায়চারি করে মীনার কাছে এসে তার মাথায় হাত দিয়ে বলেছিলেন, ভাবিস নে তুই, আমি তাকে বাঁচাব, আমার সর্বস্ব খরচ করেও বাঁচাব।

মীনা কোন কথা বলে নি—স্থির নির্বাক হয়ে বসে ছিল। মুখরা মেয়েটি মূক হয়ে গেল সেইদিন থেকে। চার বছর সেই মূক হয়ে আছে। হোক, বিচার শেষ হোক, আর সে পারছে না।

সেদিনও মীনা বসে ছিল স্তব্ধ হয়ে মাটির পুতুলের মত।

তার চুলে আঙুল চালিয়ে দিচ্ছিলেন ওর মা।

মা বললেন, কালীনাথের বউ কারও সঙ্গে দেখা করে নি, ফিরিয়ে দিয়েছে, ক্ষমা সে করবে না।

মীনা উদাস দৃষ্টিতে চেয়ে রইল।

মা বললেন, তুই একবার যাবি?

মীনা নীরবে ব্রজরাণীর মতই ঘাড় নাড়লে, না।

মা বললেন, কিন্তু এর জন্যে দায়ী তো···

—আমি। কিছুক্ষণ চুপ করে থেকে আজ সে বললে, তোমরা আমাকে ছেড়ে দাও, আমি আদালতে গিয়ে সব কথা বলে বলি দায়ী আমি!

—সে তো আদালত শুনবে না মীনা। অনন্ত খুন করেছে, ব্রজরাণী তার সাক্ষী।

একটু চুপ করে থেকে মীনা বললে, তবে শুধু তার কাছেই ক্ষমা চাইব আমি। সেদিন—

স্তব্ধ হয়ে গেল সে।

সে মনশ্চক্ষে দেখলে, অনন্তর চাবুক-খাওয়া বিপর্যস্ত মূর্তি।

অনন্ত চলে যেতে যেতে একবার থমকে দাঁড়িয়েছিল।

স্থির দৃষ্টিতে সে চেয়েই রইল। পৃথিবীর আকাশ মাটি ঘর বাড়ি কে যেন ঘষে মুছে দিচ্ছে, ঝাপসা হয়ে যাচ্ছে।

মা বললেন, এখন থেকে কাঁদিস নে, কাঁদবিই তো, জীবনটাই তো পড়ে থাকবে। তার চেয়ে যদি ব্রজরাণীর কাছে—যাবি?

মীনা কেঁদেই চলল।

ঠিক সেই সময়।

তখন জেলখানার একটা সেলের গরাদেতে মাথা রেখে দাঁড়িয়ে অনন্ত।

বিশীর্ণ মুখ, বিষণ্ণ বেদনাতুর দৃষ্টি; সর্বদেহে ক্লান্তি; ভগ্ন-স্বাস্থ্য—বিশ্বের দরবারে সে যেন একজন ভিক্ষুক।

সেলটার সামনে অনতিদূরে ফাঁসির মঞ্চটা।

সেই দিকে সে তাকিয়ে দাঁড়িয়ে ছিল।

মাথার মধ্যে বিচিত্র ভবিষ্যৎ-কল্পনা তার ঘুরছিল। ক্লান্ত অর্ধোন্মাদ মস্তিষ্কে সে ভবিষ্যতের ছবি আঁকছিল।

তার মনে হল, মঞ্চের উপরে সাদা কাপড়ে মুখ ঢেকে সমস্তটা আবৃত করে একটি মূর্তি যেন এসে দাঁড়াল। তার হাতে ফাঁসির ফাঁস। সে মূর্তি একবার মনে হল ব্রজরাণীর—আবার মনে হল মীনার।

সে গরাদের ফাঁক দিয়ে দু হাত সাগ্রহে বাড়িয়ে দিলে।

ওদিকে একটা পুলিস-হুইসিলের শব্দ হল।

কয়েক মিনিট পরেই এসে দাঁড়াল ওয়ার্ডার তিনজন।

একজন দরজার তালা খুললে। বললে, চলিয়ে।

সপ্রশ্ন দৃষ্টিতে সে তাকালে।

ওয়ার্ডার বললে, আদালত—আদালতে নিয়ে যাবার গাড়ি এসেছে।

সে হেসে বিভ্রান্তের মতই বললে, যেন প্রশ্ন করলে, মুক্তি হবে আমার তা হলে? খালাস পাব?

আদালতের সামনের খোলা জায়গা। কয়েকটা গাছের ছায়ায় লোকজন দাঁড়িয়ে রয়েছে। ঘুরছে। মামলা করতে এসেছে সব।

একটি গাছতলায় দাঁড়িয়ে ছিলেন অনন্তর বাবা। মাথা হেঁট করে পায়চারি করছিলেন। আরও দু-একজন কর্মচারী দাঁড়িয়ে ছিল। আর একপাশে দাঁড়িয়ে ছিল একখানা মোটর, মোটরের ভিতরে বসে ছিল মীনা। তার বাবা ভিতরে আছেন, ব্যারিস্টারের সঙ্গে কথা বলছেন।

পুলিসের গাড়ি আদালতের সামনে দাঁড়াল। শীর্ণ অনন্তকে নামিয়ে পুলিস নিয়ে গেল ভিতরে। শীর্ণ-দেহ অনন্তকে দেখে মীনা শিউরে উঠল।

আদালত-কক্ষ সেদিন সরকারী উকিলের তীব্র তীক্ষ্ণ কণ্ঠস্বরে, ওজস্বিনী ভাষায় মুখরিত হয়ে উঠল:

মহামান্য বিচারক, ন্যায় ও ধর্মের নামে অতি নিষ্ঠুর এবং নৃশংস হত্যাকাণ্ডের বিচার প্রার্থনা করে এই মামলা ধর্মাধিকরণে উপস্থিত করছি। চার বছর আগে ২৮শে বৈশাখ কালীনাথ ঘোষাল নিহত হন। বন্দুকের গুলিতে তাঁকে হত্যা করা হয়।

সরকারী উকিলের কণ্ঠস্বর আবেগে রম্ রম্ করে উঠল, সত্য কথা বলতে কি, এই নিষ্ঠুর হত্যাকাণ্ড এখানকার সকল মানুষের মর্মমূল ধরে নাড়া দিয়েছিল। ব্রজরাণীর সঙ্গে যেন সকলেই আজ চার বছর ধরে এ হত্যার বিচার প্রার্থনা করে এসেছে। প্রতিশোধ চেয়ে এসেছে। সাবিত্রী ব্রতের দিন উপবাসধারিণী স্ত্রীর চোখের সম্মুখে তার সকরুণ আর্ত মিনতি

উপেক্ষা করে বরণ-করা ব্রাহ্মণ অসুরের মত হত্যা করেছে তার স্বামীকে। এ কি নিষ্ঠুরতা—এ কি পৈশাচিকতা!

উকিল বলে গেলেন: অভিযুক্ত আসামী অনন্ত চট্টোপাধ্যায় তাকে গুলি করে হত্যা করেছে। তার জীবনের অতি প্রিয় বন্দুক, বারো বোরের উইনচেস্টার রিপীটার, এই বন্দুক দিয়েই সে তাকে পর পর গুলি করেছিল। চেম্বারে দুটি মাত্র কার্টিজই ছিল। গুলি করে হত্যাকাণ্ড শেষ করে সে বন্দুকটি সেইখানেই ফেলে দিয়ে পালিয়ে যায়। খালি বন্দুকটি কালীনাথের শবদেহের অনতিদূরেই পাওয়া গিয়েছে।

স্তব্ধ হয়ে শুনছিল লোকে। লোকে লোকারণ্য হয়ে গেছে দায়রা আদালতের ঘরখানি। উকিল মোক্তারেরাও নীরব। মধ্যে মধ্যে পোশাকের খস্ খস্ আওয়াজ শোনা যাচ্ছিল শুধু। কখনও কাগজ ওল্টানোর খরখরে শব্দ। অভিব্যক্তিহীন মুখে বিচারক চেয়ে রয়েছেন সম্মুখের পানে।

সরকারী উকিল বলে চললেন:

এই আসামী অনন্ত, কালীনাথের নিকট-আত্মীয়, সম্পর্কে ভাই, কালীনাথের বন্ধুও ছিল সে। কিন্তু কালীনাথ ছিল শিক্ষিত, আসামী অনন্ত অশিক্ষিত, মূর্খ, দুরন্ত ক্রোধী এবং শিকার করার নামে হত্যাকাণ্ডের উপর তার একটা নেশা ছিল। সে বাইরে কালীনাথের বন্ধু হলেও তার প্রতি ঈর্ষান্বিত ছিল। কারণ কালীনাথ ছিলেন বিদ্বান, সকলের প্রশংসাভাজন, সমাজে সমাদৃত; আর ধনীপুত্র আসামী মূর্খ, দুর্দান্ত, ক্রোধী। সেই হেতু ধনীর পুত্র হয়েও সমাজে উপেক্ষিত ছিল সে। কথায় কথায় মারপিট করাই আসামীর চিরদিনের অভ্যাস। বিপুলদেহ বলবান কাবুলীওলাদের সঙ্গেও মারপিট করার নজীর আছে।

সরকারী উকিলের উচ্চ গম্ভীর কণ্ঠস্বর আদালতের বাইরে থেকে স্পষ্ট শোনা যাচ্ছিল। বাইরের বারান্দায়, সামনের গাছতলায়, নানা কর্ম-ব্যস্ততার মধ্যেও লোকে অবসর পেলেই দাঁড়িয়ে শুনছিল। তাদের সঙ্গে শুনছিলেন অনন্তর বাবা। আর শুনছিল মীনা। সে গাড়ির মধ্যে বসে সামনের সিটের ঠেস দেবার জায়গাটার উপর হাত রেখে তার মধ্যে মুখ গুঁজে নিস্পন্দের মত পড়ে ছিল।

পৃথ্বীশবাবু আদালত থেকে বেরিয়ে এলেন। সেখানে যেন তাঁর দম বন্ধ হয়ে আসছিল। মীনাকে বললেন, একবার তুই কালীনাথের স্ত্রীর সঙ্গে দেখা কর্ মীনা।

মীনা ঘাড় নাড়লে, না।

কিছুতে সে তা পারবে না। সে একান্তে বসে বার বার এ সংকল্প করতে চেয়েছে। গিয়ে ব্রজরাণীর দুটি পায়ের উপর আছাড় খেয়ে, দিদি, অপরাধ আমার, তুমি আমাকে সাজা দাও, নিরপরাধকে ক্ষমা করো—বলবার সংকল্প করতে চেয়েছে, কিন্তু কিছুতেই পারে নি—কে যেন তার গলা টিপে ধরেছে, কে যেন বলেছে, এই তো তার সাজা—এই তো তার প্রাপ্য।

ওদিকে আদালতের ঘড়িতে ঢং ঢং করে চারটে বেজে গেল। আদালত শেষ হল সেদিনের মত।

সন্ধ্যার পর অন্ধকার আকাশের দিকে তাকিয়ে বারান্দায় রেলিং ধরে দাঁড়িয়ে ছিল ব্রজরাণী।

শহরের বাড়িগুলির মধ্যে তখন অন্ধকার গাঢ় হয়ে এসেছে।

অন্ধকারের মধ্যে শুধু ব্রজরাণীর সাদা কাপড়-পরা মূর্তিটা দেখা যাচ্ছে।

নিস্তব্ধ পরিবেশ।

নিস্তব্ধতা ভঙ্গ করে ব্রজরাণীর মায়ের কণ্ঠস্বর শোনা গেল, ব্রজ!

তিনি বারান্দায় বেরিয়ে এলেন।

—একটু বাইরে গিয়েছি আর তুই উঠে চলে এসেছিস? আয়, ঘরে আয়!

অস্ফুট কণ্ঠে সে বললে, না। কথার সঙ্গে সেই ভঙ্গিতে ঘাড় নাড়লে, ঘুম আসছে না, পারব না ঘুমুতে, না।

—কাল যে তোকে সাক্ষী দিতে হবে।

—কাল ঘুমোব, আজ নয়।

বাকি রাতটা জেগেই কাটালে সে। অন্ধকারের মধ্যে স্থির দৃষ্টিতে তাকিয়ে সে বসে রইল। সে যেন দেখতে পাচ্ছিল, নিষ্ঠুর বন্ধনে সেই অসুরটাকে বেঁধে নিয়ে এসেছে বিচারালয়ে। সে উদ্ধত দৃষ্টিতে দৃপ্ত ভঙ্গিতে তাকিয়ে রয়েছে। সে তো মৃত্যুকে ভয় করে না। বাঘের মত ভয়ঙ্করকে হত্যা করে সে তার উপর পা রেখে দাঁড়িয়েছিল। সে মূর্তি তার চোখের উপর ভাসছে।

হঠাৎ একটা কর্কশ শব্দে সে চমকে উঠল। কি? কিসের শব্দ? সঙ্গে সঙ্গে মনে পড়ে গেল তাদের বাসরঘরের স্মৃতি। এমনি ডাক, তার পরেই অতি নিষ্ঠুর উচ্চ শব্দ—বন্দুকের শব্দ! মনে পড়ে গেল, জানালার ধারে বন্দুক হাতে দাঁড়িয়ে অনন্ত।

ওঃ, এটা পেঁচার ডাক! রাত্রির প্রহর অতিক্রান্ত হল। সঙ্গে সঙ্গে কালেক্টরীর টাওয়ার ক্লক বাজতে শুরু করল—ঢং ঢং ঢং। তিনটে বাজল। আর সাত ঘণ্টা। কাল দশটায় আবার বিচার আরম্ভ হবে। সাক্ষী দিতে হবে তাকে। আষ্টেপৃষ্ঠে বাঁধা সেই অসুরের মত বলশালী হন্তারকের দিকে তাকিয়ে তাকে বলতে হবে, হ্যাঁ, এই। হ্যাঁ, এই সেই অসুর, তার স্বামীকে হত্যা করেছে। বলতে হবে, সে সাবিত্রী-ব্রত করেছিল, সে ভুল করে এই অসুরকে ব্রাহ্মণ বলে বরণ করেছিল, সে প্রতারিত হয়েছিল। তার স্বামী তাকে ভালবাসতেন। সে···

আঃ, গোলমাল হয়ে যাচ্ছে তার। হ্যাঁ, না-না, ঐ অসুর তার স্বামীকে ভালবাসত না, ভালবাসার ভান করত।

আঃ, গোলমাল হয়ে যাচ্ছে।

অধীর হয়ে উঠল সে। উঠে কুঁজো থেকে জল ঢেলে মাথা ধুয়ে ফেললে।

ঢং ঢং ঢং ঢং শব্দে টাওয়ার ক্লক বাজল। ব্রজরাণী বাইরে এসে বারান্দায় দাঁড়াল। এ কি যন্ত্রণা! এ কি উদ্বেগ! সে আর সহ্য করতে পারছে না। নিস্তব্ধ রাত্রির শেষ প্রহরে একা

সে প্রতিহিংসার জ্বালায় অধীর হয়ে জেগে রয়েছে। ওঃ, ভোর হবে কখন? চোখ বুজতে পারছে না সে। মনে পড়েছে স্বামীর রক্তাক্ত দেহ। আজও পর্যন্ত সে সুস্থদেহ স্বামীকে চোখ বুজে মনে করতে পারে না।

ওদিকে দিক্‌চক্রবালে উষার পাণ্ডুরাভা প্রকাশ পাচ্ছিল। একসময় বিহঙ্গ-কলরবে স্তব্ধ পৃথিবী বারেকের জন্য চকিত হল। আবার, আবার, আবার পূর্বাকাশ লাল হচ্ছে।

আঃ! রাত্রি শেষ! আজ তার ব্রত উদ্‌যাপনের শেষ দিন।

দিগন্তে সূর্যোদয় হল।

দূরে টাওয়ার ক্লকে বাজল ছটা।

ঘড়ির কাঁটা সরতে লাগল, সাতটা-আটটা-নটা-দশটা।

দশটা বাজতেই হরদাসবাবুর বাড়ির বাইরে দরজায় এসে দাঁড়াল তাঁর গাড়ি।

গাড়ির দরজা খুলে দাঁড়ালেন হরদাসবাবু।

বাড়ি থেকে বেরিয়ে এলো ব্রজরাণী।

হরদাসবাবু বললেন—শরীর ঠিক আছে তো?

—হ্যাঁ।

—ওঠো।

পিছন দিক থেকে মা এগিয়ে এসে সামনে দাঁড়ালেন।

মা তার মাথার উপর ঘোমটা তুলে দিলেন। তার ঘোমটা খসে পড়েছে; সেদিকে তার ভ্রূক্ষেপ নেই। সে যেন ধ্যানস্থ।

পিছন দিক থেকে ভ্রাতৃবধূ একখানা চাদর এনে তার গায়ে জড়িয়ে দিলেন।

সে স্থির অবিচলভাবেই গাড়িতে উঠল।

কোর্টের বারান্দার সামনে এসে দাঁড়াল গাড়ি।

সে থাকল গাড়িতে। তাকে স্পষ্ট দেখা যাচ্ছে না। সাদা আভাস দেখা যাচ্ছে। তার মাথা সিটের ব্যাকে হেলে রয়েছে।

হরদাসবাবু নেমে গেলেন গাড়ি থেকে।

আদালতের ভিতর থেকে সরকারী উকিলের কণ্ঠস্বর ভেসে আসছিল।

উকিল তখন বলছিলেন: এই মামলায় প্রধান সাক্ষী হলেন মৃত কালীনাথের স্ত্রী শ্রীমতী ব্রজরাণী দেবী। তার চোখের সামনে হত্যাকাণ্ড সংঘটিত হয়েছে। ঘটনা ঘটেছে চার বছর পূর্বে। চার বছর মস্তিষ্ক-বিকৃতির জন্য আসামী উন্মাদাগারে ছিল। আজ সুস্থ হয়েছে। কিন্তু চার বছরে ব্রজরাণী দেবীর স্মৃতি এতটুকু ম্লান হয় নি। তিনি চার বছর ধরে এই স্মৃতিকে উজ্জ্বল করে রেখেছেন—তাঁর স্বামীর হত্যার বিচার পাবার প্রত্যাশায়। আর যাঁরা সাক্ষী আছেন, তাঁরা প্রত্যেকেই বিভিন্ন বিষয়ে বিশেষজ্ঞ। শব ব্যবচ্ছেদ করেছেন ডাক্তার, অস্ত্র বিষয়ে বিশেষজ্ঞ—যে বন্দুক দিয়ে হত্যাকাণ্ড সাধিত হয়েছে পরীক্ষা করেছেন তিনি। তাঁদের

সেই সময়ের রিপোর্ট আছে। তদন্তকারী দারোগার ডায়েরী আছে। সেও পুরনো হয় নি। সে সমস্তই দাখিল করা হয়েছে মাননীয় বিচারপতির কাছে। মাননীয় বিচারপতির নিকট, ভারতীয় দণ্ডবিধির ধারামতে আক্রোশবশত ইচ্ছাপূর্বক নর-হত্যার দায়ে আসামীকে অভিযুক্ত করে, ন্যায় ও ধর্মের নামে আমি বিচার প্রার্থনা করি।

বিচারক কাগজপত্র ওল্টাতে লাগলেন। কলম তুলে নিলেন।

দর্শকদের মধ্যে গুঞ্জন; উকিলদের কানাকানি; এরই মধ্যে হরদাসবাবু এসে সরকারী উকিলকে কানে কানে কি বললেন। পিছন দিক থেকে একজন কেউ বলে উঠল, রাস্তায় দাঁড় করিয়ে ওকেও গুলি করে মারা হোক!

একজন পুলিস কর্মচারী।—চুপ, চুপ।

ভিড়ের ভিতর থেকে একজন ভিড় ঠেলে উত্তেজিত ভাবে বেরিয়ে গেল, না, চুপ করে থাকতে পারছি নে। উঃ, এত বড় নৃশংস হত্যা…

উকিলদের আসন থেকে উঠে হরদাসবাবু বেরিয়ে চলে গেলেন। ব্রজরাণীকে আনতে হবে।

ঢং ঢং শব্দ করে টাওয়ার ক্লকে দুটো বাজল।

কোর্ট পিওন বারান্দায় বেরিয়ে এসে হাঁকলে, শ্রীমতী ব্রজরাণী দেবী!

আবার হাঁকলে, সাক্ষী শ্রীমতী ব্রজরাণী দেবী!

গাড়ির দিকে এগিয়ে গেলেন হরদাসবাবু। ব্রজরাণী অকম্পিত পদেই নামল। চোখে তার বিচিত্র দৃষ্টি, মুখের ভাবরূপ অপূর্ব, তার ব্যাখ্যা করা চলে না। মাথার অবগুণ্ঠন খসে পড়েছে। রুক্ষ কেশভার এলিয়ে যাচ্ছে। সে যেন এক তপস্বিনী—সে যেন জলন্ত বহ্নিশিখা। কোর্টের বারান্দা দিয়ে উঠে এলো হরদাসবাবুর পিছনে পিছনে।

কোর্টের ভিতর জজ-জুরী ব্যগ্র দৃষ্টিতে তাকিয়ে আছেন। দর্শকও অগণিত। শুধু আসামী মাথা নুইয়ে কাঠগড়ার উপর রেখে কোন মতে দাঁড়িয়ে আছে। সে এই ভাবেই রয়েছে প্রথম থেকে। দর্শকেরাও তাকে ভাল করে দেখে নি।

কোর্ট ইন্সপেক্টার বললেন, পথ ছাড়ুন, পথ ছাড়ুন।

দর্শকেরা দু ভাগ হয়ে পথ করে দিল।

দরজার মুখে শ্বেত-বস্ত্রাবৃতা মূর্তি।

মাথার ঘোমটা ও চাদরখানা মুখখানিকে নাকের প্রান্তভাগ পর্যন্ত ঢেকে ফেলেছে।

ইন্সপেক্টার বললেন, সাক্ষী শ্রীমতী ব্রজরাণী দেবী!

ঠিক যেন অনন্তর দেখা ফাঁসির মঞ্চের উপরের মূর্তি ধীর পদক্ষেপে এগিয়ে আসছে।

ইন্সপেক্টার তাকে পথ দেখিয়ে সাক্ষীর ডকের পথ দেখিয়ে দিলেন।

পেশকার উঠে তাকে হলফ নেওয়ালে, ধরুন, এই গীতা ধরে বলুন—। হলফ পাঠ করিয়ে গেলেন তিনি। কি নাম আপনার?

—ব্রজরাণী দেবী।

আসামী এতক্ষণে মুখ তুললে।

চমকে উঠল সে। এ কে? এ কে? আঃ, হায় রে! এ কি সেই? আঃ, ছি ছি ছি! তার সামনে ধীরে ধীরে কোর্টের পারিপার্শ্বিক মুছে গেল। শুধু রইল মূর্তিটি! চোখের জলে তার মুখ ভেসে গেল। কাঁদতে কাঁদতে মাথা রাখলে কাঠগড়ার উপর।

উকিল প্রশ্ন করলেন, আপনিই শ্রীমতী ব্রজরাণী দেবী?

—হ্যাঁ।

—কালীনাথ ঘোষাল আপনার কে হতেন? স্বামী?

—হ্যাঁ, আমার স্বামী।

—আপনার স্বামী খুন হয়ে মারা গেছেন, এ কথা কি সত্য?

—হ্যাঁ, বন্দুকের গুলিতে। বন্দুক করে—। দৃষ্টি তার বিস্ফারিত হয়ে উঠল। সরকারী উকিলের দিকে তাকিয়ে কথার উত্তর দিচ্ছিল সে। সরকারী উকিলও সে দৃষ্টি দেখে শিউরে উঠলেন।

আত্মসম্বরণ করে উকিল আবার প্রশ্ন করলেন, কে খুন করেছে, আপনি জানেন?

—হ্যাঁ, জানি। আমার চোখের উপর, আমার সামনে, বন্দুকের গুলিতে। অসুরের মত —অসুর সে।

—তাকে চিনতে পারবেন?

ব্রজরাণীর মনশ্চক্ষে ভেসে উঠল অনন্তর রুদ্র মূর্তি। স্মরণ করে সে শিউরে উঠল।

উকিল প্রশ্ন করলেন, ওই কাঠগড়ায় যে আসামী দাঁড়িয়ে আছে দেখুন তো! আঙুল বাড়িয়ে দেখালেন তিনি। সে ভাঙা বনস্পতির মত কাঠগড়ার হাতলের উপর মাথা রেখে ভেঙে পড়ে গেছে যেন। মুখ তার দেখা যাচ্ছে না। উকিল তাকে বললেন, এই মুখ তোল, তুমি মুখ তোল।

সে অতি কষ্টে সোজা হয়ে দাঁড়াল, মুখ তুললে।

সে মুখের ঘোমটা টেনে তুললে কপাল পর্যন্ত। কই সে? কই? কোথায়?

অনন্তকে দেখে দৃষ্টি বিস্ফারিত হয়ে উঠল।

তার দিক থেকে দৃষ্টি ফিরিয়ে চারিদিকে সে খুঁজলে।

উকিল বুঝতে পারলেন, সে চিনতে পারছে না। তিনি আবার আঙুল দিয়ে দেখালেন, এই যে, এই যে আসামী—এই!

তার বিস্ফারিত বিস্মিত দৃষ্টি আবার নিবদ্ধ হল অনন্তর দিকে।

কিছুক্ষণ চেয়ে দেখে কি যেন হয়ে গেল তার। সে সজোরে চোখ বুজলে।

এই রুদ্রমূর্তি অনন্ত! ঝাপ্‌সা হয়ে যেতে লাগল। দুনিয়া যেন গলে মিলিয়ে যাচ্ছে।

এ কে? এই শীর্ণ দেহ, ভেঙে বেঁকে গেছে যে দেহখানা, দুর্বল, থর থর করে কাঁপছে, চোখে বিভ্রান্ত বিহ্বল কাঙালের দৃষ্টি; মাথার চুল উঠে গেছে, যে কটি আছে তার বর্ণ—স্বাস্থ্যের বার্ধক্যের জীর্ণতায় সাদা হয়ে গেছে অধিকাংশ; উঃ, সর্বাঙ্গে কি নিদারুণ প্রহারের

চিহ্ন! যেন কেউ মানুষটাকে নিষ্ঠুর প্রহারে জর্জরিত করে দুমড়ে ভেঙে দিয়েছে। দীপ্তিহীন নিষ্প্রভ চোখ, সর্বদেহে নিদারুণ ক্লান্তি, দাঁড়াবার ভঙ্গিতে সকরুণ অসহায় দুর্বলতা। নিস্তেজ স্তিমিত-প্রাণ অসহায় আত্মীয়হীন স্বজনহীন বান্ধবহীন নিঃশেষে কাঙাল একটি; বিশ্ব-ব্রহ্মাণ্ডের কাছে উদাস, নীরব যাচঞায় করুণা প্রার্থনা করে দাঁড়িয়ে আছে। হায় রে, একেই এরা বেঁধে এনেছে হত্যাকারী বলে! একেই ফাঁসিকাঠে ঝুলিয়ে দেবার জন্যে এত আয়োজন এত আড়ম্বর! সারা আদালতে শত শত প্রতিশোধ-কঠিন দৃষ্টি হতভাগ্যকে লেহন করছে; কি রুক্ষ-কঠিন দৃষ্টি সব! দর্শক উকিল পুলিস সব—সব নিষ্ঠুর দৃষ্টিতে ওর দিকে চেয়ে রয়েছে। জজের দিকে চাইলে সে একবার। তাঁর দৃষ্টি, তাঁর মুখ অভিব্যক্তিহীন, হাতে কলমটি উদ্যত করে বসে রয়েছেন। প্রতীক্ষা করে রয়েছেন তার কথার। হতভাগ্যের চোখ দিয়ে জল গড়িয়ে আসছে। দুটি নিটোল মুক্তা নেমে আসছে চোখের দুটি কোণ থেকে। তার সমস্ত অন্তর যেন হাহাকার করে উঠল। কাকে শাস্তি দেবে সে? এ কে? এই সর্বরিক্ত ভিক্ষুক কে? কে তাকে এমন করলে? সে আবার চোখ বুজলে।

অনন্তও থর থর করে কাঁপছিল, কাঠগড়ার হাতল ধরে দাঁড়িয়ে নিষ্পলক দৃষ্টিতে তাকিয়ে ছিল তার দিকে। আঃ রে, এই রাজলক্ষ্মীকে, সোনার প্রতিমাকে এমন করে কে সর্বরিক্ত করে দিলে রে! কত চেনা, তবু যেন ঠিক চিনতে পারছে না সে! কে? কে? ঠোঁট দুটি তার থর থর করে কাঁপছিল। নাঃ, এ তো গুলি-খাওয়া কালীনাথের সঙ্গে তার হাত ধরে ফাঁসির দড়ি হাতে পিছনে পিছনে তাড়া করে নি!

আদালত স্তব্ধ, দর্শকেরা স্তব্ধ, উকিলেরা স্তব্ধ, রুদ্ধশ্বাসে প্রতীক্ষা করছে সকলে। সূচীভেদ্য স্তব্ধতা। মাথার উপর কড়িকাঠের কাছে একটা ভ্রমর শুধু পাখার আওয়াজে একটানা গুঞ্জন-ধ্বনি তুলে চলেছে। সমস্ত পৃথিবীর অক্ষদণ্ড যেন আজ এই আদালত ঘরখানি, সমস্ত পৃথিবী এই অক্ষদণ্ডকে আশ্রয় করে এই মুহূর্তে স্থির হয়ে দাঁড়িয়ে আছে। তার রুদ্ধ ঘূর্ণন-শক্তি মৃদুগুঞ্জনে নিজেকে প্রকাশ করছে। সে কথা বলবামাত্র যেন তা মহাবেগে ঘুরতে শুরু করবে।

অধীর হয়ে সরকারী উকিল প্রশ্ন করলেন, প্রশ্নের ছলে উত্তর ধরিয়ে দিলেন, দেখুন, ভাল করে দেখুন!

সে চোখ খুললে। আবার তাকালে অনন্তর দিকে। চিৎকার করে উঠল, না—না—এ নয়। না-না-না।

উকিল বললেন, ওর চেহারার অনেক পরিবর্তন হয়েছে। তবুও নিশ্চয় আপনি চিনতে পারবেন। এই কি আপনার স্বামীকে খুন করেছে?

সে মুখ ফিরিয়ে সামনের খোলা জানালার দিকে তাকালে। যেখানে নীল আকাশ নিঃসীম উদাসীনতায় সম্প্রসারিত। প্রসন্ন শান্ত। সেদিকে তাকিয়ে রইল সে কিছুক্ষণ, তারপর ঘাড় নাড়লে ধীরে ধীরে। ইঙ্গিতে জানালে—না—এ সে নয়।

উকিল বিভ্রান্ত হয়ে ভুরু কুঁচকে প্রশ্ন করলেন, কি বলছেন মুখে বলুন?

—না।

চমকে উঠলেন উকিল, কি বলছেন? না মানে কি? এ সে নয়?

—না।

—দেখুন, দেখুন, ভাল করে দেখুন। আপনার স্বামীহন্তাকে চিনতে পারছেন না আপনি? ভাল করে ভেবে বলুন কি বলছেন?

—না।

এবার সে চোখ বন্ধ করে ভাল করে আপন অন্তর সন্ধান করে নিজেকে নিজে প্রশ্ন করে বুঝে ধীরে ধীরে ঘাড় নাড়লে। চোখ খুলে স্পষ্ট কম্পিত কণ্ঠে বললে, না।

সমস্ত আদালতে একটা সবিস্ময় গুঞ্জন-ধ্বনি উঠল, না? না? না? না? না?

আদালত ঘর থেকে বাইরের বারান্দায় সে বিস্মিত গুঞ্জন সম্প্রসারিত হল—না? না?

না? বারান্দা থেকে নীচে গাছতলায় জনতার মধ্যে—না? না? না?

কিছুক্ষণ পর সিঁড়ি বেয়ে নেমে এলেন হরদাসবাবু। তাঁর পাশে অনবগুণ্ঠিতা ব্রজরাণী। শান্ত ধীর প্রসন্ন মুখে কোমল স্নিগ্ধতা।

একটুক্ষণের জন্য সে দাঁড়াল। চারিদিকে একবার চেয়ে দেখলে।

শুষ্ক পৃথিবী সরস সুন্দর কোমল হয়ে উঠেছে।

চোখ নিবদ্ধ হল আদালত-প্রাঙ্গণে একটি ফুলে-ভরা গাছের দিকে। বিমুগ্ধ হয়ে সে সেইদিকে তাকিয়ে রইল। ওঃ, কতদিন এমন সুন্দর ফুল সে চোখে দেখে নি! কত দিন! আঃ, কি সুন্দর!

হরদাসবাবু তাকে হাতে ধরে গাড়িতে ওঠালেন। গাড়িটা চলে গেল। ওদিকে আর একখানা গাড়ি দাঁড়িয়ে ছিল। সেই গাড়ি থেকে নেমে এলো আর একটি মেয়ে। তারও মাথায় ঘোমটা নেই, সঙ্কোচ নেই। সে এসে ব্রজরাণী যেখানে দাঁড়িয়ে ছিল সেখানকার এক মুঠো ধুলো তুলে নিয়ে মাথায় বুলিয়ে ধূলি-ধূসরিত করে তুললে নিজেকে।

ব্রজরাণী বাড়ি ফিরে সোজা এসে কালীনাথের ছবির সামনে দাঁড়াল।

হাত দুখানি ছবির পায়ের দিকে বাড়িয়ে দিলে। তারপর শুয়ে পড়ল সেইখানে। আঃ, কত ঘুম নেমে আসছে তার চোখে!